

# জব্বার হেফাজত

ইমাম মুহিউদ্দিন আন নববী رحمۃ اللہ علیہ

মাওলানা আহমাদ ইউসুফ শরীফ অনূদিত

# জবানের হেফাজত

মূল

ইমাম মুহিউদ্দীন আন নববী রহ.

অনুবাদ

মাওলানা আহমাদ ইউসুফ শরীফ



মাকতাবাতুল কুর

ইসলামি টাওয়ার ২য় তলা, দোকান-৩৩  
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (صلى الله عليه وسلم)  
قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت

আবু হুরাইরা (رضি) রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, 'যে  
ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ-দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে, সে  
যেন ভালো কথা বলে নতুবা চুপ থাকে।'

সহীহ বুখারী : ৬৪৭৫

## বিষয়সূচি

ভূমিকা	০৮
অনুবাদকের কথা	১৫
ইমাম নববী (رحمہ اللہ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী	১৮
জবানের হেফাজত	২৫
উত্তম কথা ব্যতীত অন্য কথা হতে জবানকে হেফাজত করা	২৬
গীবত ও কুৎসা রটনা (চোগলখুরি) হারাম	৩৬
গীবত	৩৭
চোগলখুরি বা কুৎসা রটনা	
বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একের কথা অন্যকে বলা	৩৮
গীবতের সংজ্ঞা ও পরিধি সম্পর্কিত কিছু জরুরি বিষয়	৪৩
গীবত করা ও শোনা উভয়ই হারাম	৪৫
গীবত ত্যাগের বর্ণনা	৪৭
বৈধ এবং হালাল গীবতের বর্ণনা	৪৯
উস্তাদ, সঙ্গী বা অন্যদের গীবত শুনলে করণীয়	৫৬
মনে মনে গীবত করা	৫৯
গীবতের কাফফারা ও তা থেকে তাওবা করা	৬৪
চোগলখুরি বা কুৎসা রটনা	৬৯
ফিতনা ইত্যাদির আশঙ্কা থাকলে আমীর-উমারার নিকট	
বিনা প্রয়োজনে অন্যের কথা বলা নিষেধ	৭২
শরীয়তসম্মত বংশমর্যাদাকে তিরস্কার করা নিষেধ	৭২
আত্ম-অহমিকা প্রকাশ করা নিষেধ	৭৩
মুসলমানের বিপদে উল্লাস প্রকাশ করা নিষেধ	৭৩
মুসলমানকে হেয় করা ও উপহাস করা হারাম	৭৪
মিথ্যা সাক্ষ্যদান কঠোরভাবে হারাম ও নিষিদ্ধ	৭৬



দান করে খোঁটা দেওয়া নিষেধ	৭৭
অভিসম্পাত করা নিষেধ	৭৮
নাম-পরিচয় উল্লেখ না করে গুনাহগার ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করা	৮১
মুসলমানকে অভিসম্পাত করা হারাম	৮৪
যে ব্যক্তি অভিসম্পাতের যোগ্য নন, তাকে অভিশাপ দিলে করণীয়	৮৫
শিক্ষা ও সতর্কতামূলক বিভিন্ন বাক্যের ব্যবহার	৮৬
দরিদ্র, দুর্বল, ইয়াতিম ও ভিখারির প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করা	
এবং তাদের প্রতি বিনয় প্রদর্শন করে কোমল ভাষায় কথা বলা	৮৮
যে সকল শব্দের ব্যবহার মাকরুহ	৯০
আঙুরকে 'কারম' বলে ডাকা নিষেধ	৯১
মানুষকে দোষারোপ করা, অহমিকা ও দস্ত প্রকাশ করা	৯২
ইচ্ছা প্রকাশের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে মাখলুককে শরিক না করা	৯৪
নিয়ামত দানকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা	৯৫
ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার শর্তযুক্ত বাক্য বলা	৯৫
কোনো মুসলমানকে 'হে কাফের' বলে সম্বোধন করা জঘন্য হারাম	৯৬
কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে ঈমানহারা হওয়ার বদ-দুআ করা নিষেধ	৯৭
কুফরি বাক্য উচ্চারণে চাপ প্রয়োগ করলে কী করবে?	৯৭
কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার বিধান	৯৯
ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে কালিমা পাঠ করলে তার বিধান কী?	৯৯
কাউকে খলিফাতুল্লাহ বলা	১০০
শাসককে এমন নামে ডাকা, যা আল্লাহর শানে প্রযোজ্য	১০২
সায়্যিদ শব্দের ব্যবহার	১০৩
মালিক ও কর্মচারীর পরস্পর সম্বোধনের আদব	১০৫
বাতাসকে গালমন্দ করা নিষেধ	১০৯
জ্বর ইত্যাদি রোগকে গালমন্দ করা নিষেধ	১১০

মোরগকে গালি দেওয়া নিষেধ	১১১
জাহিলী যুগের বাক্যে শোক প্রকাশ করা নিষেধ	১১১
মুহাররম মাসকে সফর নামে ডাকা	১১১
অমুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর জন্য মাগফিরাত কামনা করা	১১১
মুসলমানকে গালি দেওয়া	১১২
কাউকে মন্দ নামে ডাকা মাকরুহ	১১২
‘আমার সাথে আব্বাহ ছাড়া কোনো মাখলুক ছিল না’ এ-জাতীয় কথা বলা	১১৩
ইবাদতের কসম করা	১১৪
জাহিলী যুগের শব্দ ব্যবহার	১১৪
তিন জনের উপস্থিতিতে দুজন কানে কানে কথা বলা মাকরুহ	১১৫
শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া নিজের স্বামী বা অন্য কোনো পুরুষের নিকট	
কোনো নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা করা মাকরুহ	১১৬
নবদম্পতিকে ‘সুখ ও সন্তান লাভের’ আশীর্বাদ জানানো মাকরুহ	১১৭
ক্রোধান্বিত ব্যক্তিকে উপদেশ দান	১১৭
আব্বাহ জানেন ‘এমন হয়েছে বা হয়নি’ এ-জাতীয় কথা বলা নিষেধ	১১৮
আব্বাহ তাআলাকে ইচ্ছাধিকার দিয়ে দুআ করা মাকরুহ	১১৯
গাইরুআব্বাহর (মাখলুকের) নামে কসম খাওয়া মাকরুহ	১২০
কেনাবেচায় কসম খাওয়া মাকরুহ	১২১
রংধনুকে ‘قَوْسُ فَرْحٍ’ শয়তানের ধনুক’ না বলা	১২১
অন্যের নিকট নিজের দোষ বলে বেড়ানো নিষেধ	১২২
পরিবারের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করা হারাম	১২৩
কল্যাণকর খাতে ব্যয় করা অর্থকে জরিমানা মনে না করা	১২৩
মুক্তাদির জন্য ইমামের তিলাওয়াত পুনরাবৃত্তি করা নিষেধ	১২৪
খাজনা আদায় করাকে ন্যায়সংগত মনে করা নিষেধ	১২৫
আব্বাহর নাম নিয়ে কিছু চাওয়া	১২৫



আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু চাওয়ার বিধান	১২৫
আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন বলা মাকরুহ	১২৬
আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক' বলা জায়েজ	১২৭
ঝগড়া, বিবাদ ও শত্রুতার নিন্দা	১২৭
যেভাবে কথা বলা মাকরুহ	১৩১
ইশার নামাজের পর অনর্থক কথাবার্তা বলা মাকরুহ	১৩৩
ইশাকে 'عَظْمَة' 'অন্ধকার' বা মাগরিবকে ইশা বলা মাকরুহ	১৩৬
কারও গোপন কথা ফাঁস করা নিষেধ	১৩৭
কারও নিকট তার স্ত্রীকে প্রহার করার কারণ জানতে চাওয়া নিষেধ	১৩৮
কাব্যচর্চা	১৩৮
অশ্লীল ও নোংরা কথা বলা নিষেধ	১৩৯
পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার	১৪২
মিথ্যার প্রকারভেদ এবং এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা	১৪৪
এমন মিথ্যা, যা হারামের বিধান হতে মুক্ত	১৪৫
যে যা বলে তা-ই সঠিক মনে করা	
এবং সঠিক ধারণা ছাড়া শোনা কথা বলে বেড়ানো নিষেধ	১৪৯
ঘুরিয়ে কথা বলা ও দ্ব্যর্থবোধক কথা	১৫১
যারা খারাপ কথা বলে তাদের সাথে করণীয়	১৫৫
উলামায়ে কেরামের এক জামাত কর্তৃক	
মাকরুহ ফাতওয়া দেওয়া কিছু বিষয়, যা মূলত মাকরুহ নয়	১৫৭
মাকরুহ সম্পর্কিত ভ্রান্ত বক্তব্যসমূহ	১৫৯

## ভূমিকা

জবানের হেফাজত : বিষয়ের ব্যাপকতা অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। দুরুদ ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ মুস্তফা (ﷺ)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সঙ্গী-সাথীদের প্রতি।

ইসলাম আমাদের নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতের মতো দৈনিক ও আর্থিক ইবাদতের নির্দেশ প্রদানের পাশাপাশি চারিত্রিক উন্নতিসাধনেও দিয়েছে নানারকম দিক-নির্দেশনা। ফরজ ইবাদতের সাথে সেসব নির্দেশনাকে মান্য করার গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়। ইসলাম যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন, তাই জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিটি বিষয়ে আছে তার সুস্পষ্ট বিধিবিধান। এসব সুশৃঙ্খল ও সংগতিপূর্ণ বিধিবিধান একজন মানুষের জীবনকে সুন্দর, উন্নত ও নিটোল করতে অনেক বেশি ভূমিকা রাখে।

মানবদেহে গুরুত্বপূর্ণ যত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে তার মধ্যে অন্যতম হলো মুখ বা জবান। এই জবানের একটিমাত্র বাক্য একজন মানুষকে কুফরির কালো থেকে ঈমানের আলোতে নিয়ে আসতে পারে আবার ঈমানের আলো থেকে কুফরির কালোতে ছুড়েও ফেলতে পারে। জবানের একটিমাত্র শব্দ দুজন মানুষের মধ্যকার দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠা সুখময় দাম্পত্য জীবনের বাগিচাকে নিমেষেই তছনছ করে নাস্তানাবুদ করে দিতে পারে, আবার সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা কাউকে জীবনসঙ্গীরূপে বরিত করতে পারে। জবানের কর্তব্যাক্রিয়া যদি হন হাকিম, তবে তার জবানের সামান্য ইশারা উড়িয়ে দিতে পারে কারও গর্দান আবার ফাঁসির রজ্জু গলায় পরানো কাউকে ফাঁসির মঞ্চ থেকে নামিয়ে দিতে পারে সম্মান। মোটকথা, জীবনের চলার পথে জবানের ভূমিকাটা যারপরনাই বেশি।

জবানের এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের কারণেই ইসলাম এর ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে তার অনুসারীদের। যাতে করে এর গলত



ব্যবহার হাশরের ময়দানে একজন ব্যক্তিকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে না দেয়। আল্লাহর নবী (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন বললে ভালো কিছু বলে, নয়তো চুপ থাকে।’

একজন উত্তম মুসলিমের পরিচয় হিসাবে বলা হয়েছে,

مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ، وَيَدِهِ

যার হাত ও জবান থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে তিনিই হলেন প্রকৃত মুসলিম।<sup>১</sup>

আবার যে ব্যক্তি তার জবান ও লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে, নবী (ﷺ) তার জান্নাতে যাবার দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন।<sup>২</sup> এসবের বিস্তারিত বিবরণ পাঠক বইয়ের ভেতরেই পাবেন।

ইসলামের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হচ্ছে এর বিধিবিধান কোনো নির্দিষ্ট যুগের মধ্যে আবদ্ধ নয়। এটি ব্যাপক ও সর্বযুগীয় একটি দ্বীন। চির-আধুনিক ও চির-নতুন দ্বীন। যেহেতু এই দ্বীন এসেছে প্রজ্ঞাময় মহান প্রভু আল্লাহর পক্ষ থেকে আর তিনি ত্রিকালের জ্ঞান রাখেন তাই আমাদের কাছে অনাগত দিনে সময়ের স্রোত বেয়ে যে পরিবর্তন আসবে, আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীনের অবকাঠামোকে সে অনুযায়ীই সাজিয়েছেন। দ্বীনের নির্দেশনাগুলো তিনি এমনভাবে প্রদান করেছেন যে, স্থান-কালের বিবর্তন তাকে ফ্যাকাশে করতে পারে না। যুগ-যুগান্তরের পরিবর্তনে তার মধ্যে কোনো পরিমার্জনের প্রয়োজন পড়ে না। শুধু একটু বিচক্ষণতার সাথে যুগের পরিক্রমাকে সামনে রেখে প্রত্যেকটি বিষয়কে মিলিয়ে নিতে হয়, এই যা।

১. বুখারী: ৬১৩৬

২. বুখারী: ১১

৩. বুখারী: ৬৪৭৪



আল্লাহ তাআলা জবানের হেফাজত করার জন্য আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা যা-ই উচ্চারণ করি না কেন তা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। পবিত্র কুরআনে তিনি বলেছেন :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

“সে (মানুষ) যা-ই উচ্চারণ করে তা (লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য) তার কাছে রয়েছে সতর্ক প্রহরী।”<sup>৪</sup>

এখানে আয়াতে ব্যবহৃত (يَلْفِظُ) শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ‘লফজ’-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু নিষ্ক্ষেপ করা বা ছুড়ে মারা। মানুষ তার মনের অভিব্যক্তি অনেকভাবেই ছুড়ে মারে তথা প্রকাশ করে। চাই তা মুখে উচ্চারণ করে হোক, কলমে লিখে হোক বা কিবোর্ডে টাইপ করে হোক কিংবা অন্য যেকোনো পন্থা অবলম্বন করে হোক। প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাআলার শব্দচয়নটাই এখানে এমন যে, যুগের যত বিবর্তনই হোক, মানব-সভ্যতার উত্তরোত্তর উন্নতির হাত ধরে মানবমনের ভাব প্রকাশের যত আধুনিক মাধ্যমই আবিষ্কৃত হোক—সবকিছু অনায়াসে এই আয়াতের আওতাভুক্ত হয়ে যায়। এর বাইরে যাওয়ার কোনো ধরনের সুযোগ নেই। তার মানে ইসলামের জবান-বিষয়ক নির্দেশনা যে কেবল চামড়ায় তৈরি মুখের সাথে সুনির্দিষ্ট, ব্যাপারটা তেমন নয়; বরং এর পরিধি আরও অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত।

বর্তমানে চলছে টেকনোলজির উন্নতির যুগ। চারদিকে চলছে নিত্যনতুন মাধ্যমের হরহামেশা আগমন। সমাজ-জীবন এখন অনেক পাল্টে গেছে। মানুষের প্রকৃত জীবন-জগতের বাইরেও তৈরি হচ্ছে ভিন্ন আরেকটা অন্তর্জালিক জগৎ। সোজা কথায় বলতে গেলে আমাদের জীবনের অস্তিত্ব ও উপস্থিতি রিয়েল লাইফ আর ভার্চুয়াল লাইফে বিভক্ত হয়ে গেছে। দু-ধরনের সমাজে এখন আমাদের বসবাস। জবানের হেফাজতের ইসলামী নির্দেশনাগুলো আমাদের রিয়েল লাইফ বা বাস্তব জীবনে যতটুকু

৪. সূরা কাফ, ৫০ : ১৮

প্রযোজ্য, ভার্চুয়াল লাইফ বা অন্তর্জালিক জীবনেও ঠিক ততটুকুই প্রযোজ্য। কিন্তু এই জায়গার চিত্রটা বড়ই দুঃখজনক আর বেদনাময়। দুই জগতের 'আমি' ও 'আমরা'-এর মধ্যে দেখা যায় বিস্তর ব্যবধান।

ভার্চুয়াল লাইফের নমুনা হিসাবে এখানে ফেসবুকের কথাই বলি। এই একটি সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম আমাদের অনেকের জীবনের বাঁকে এনেছে নানান ধরনের পরিবর্তন। এই জগৎটির একটি বড় সুবিধা হলো, এখানে মন্তব্য প্রকাশে মানুষ থাকে পুরোপুরি স্বাধীন। যাকে যা ইচ্ছা বলা যায়। কেউ যেহেতু কারও সামনে থাকে না তাই চক্ষুপূজা বলতে যে একটা জিনিস রিয়েল লাইফে কাজ করে, এখানে এসে তা অনেকের ক্ষেত্রেই হাওয়া হয়ে যায়। আবার সামনা-সামনি থাকলে মুখে লাগাম রেখে কথা বলার একটা বাধ্যবাধকতা থাকে। কিন্তু ফেসবুকে সেটার বালাই থাকে না। ফলে সামনা-সামনি হলে যার সামনে কথা বলতেই সাহস হতো না, এখানে তাকে মনের মাধুরী মিশিয়ে যাচ্ছেতাই বলে দিতে পারছে মানুষ। এসব কারণে দেখা যাচ্ছে, বাস্তব জীবনে যে লোকটি কখনো কটুবাক্য ব্যবহার করেন না, এখানে এসে তিনিও বেপরোয়া হয়ে ওঠেন অনেক সময়।

গীবত-কুৎসা, বদনামি-তাচ্ছিল্য ইত্যাকার নানা মন্দাচার থেকে অনেকেই বাস্তব জীবনে সতর্ক ও সচেতন থাকলেও ভার্চুয়াল জীবনে এসবকে খোড়াই কেয়ার করে। ভাবখানা থাকে এমন যে, ইসলামের সীমানা বাস্তব জীবন পর্যন্তই। এর থেকে আগ বেড়ে ফেসবুকের মতো ভার্চুয়াল জায়গায় ইসলামের নির্দেশনাগুলো অকার্যকর ও মূল্যহীন। এ ধরনের মানসিকতা থেকেই ট্রলবাজি আর পারস্পরিক কামড়া-কামড়ির উৎপত্তি। অথচ কুরআন কত শক্তভাবে বলছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ①



“হে ঈমানদারগণ, কোনো সম্প্রদায় যেন অপর কোনো সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ না করে। হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোনো নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রূপ না করে। হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা কোরো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম কতই-না নিকৃষ্ট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো জালেম।”<sup>৫</sup>

এই আয়াতটা আবার পড়ুন। তারপর এর আলোকে সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমের বাস্তব অবস্থাকে অবলোকন করুন। নিশ্চয়ই যে চিত্র আপনার সামনে উদ্ভাসিত হবে তা অত্যন্ত দুঃখের ও বেদনার। আমরা নিজেরাই নিজেদের সবচেয়ে বড় শত্রু বানিয়ে ফেলেছি। নিজেদের কথার বাক্যবাণ শত্রুর প্রতি না ছুড়ে মুসলিম ভাইয়ের দিকেই ছুড়ে দিচ্ছি। আমাদের কিবোর্ড সদা ব্যস্ত থাকছে অন্য ভাইয়ের ইজ্জতের ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপের কাজে। জবানের কথামালা কিবোর্ডের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে স্ক্রিনের পাতায়। এ ক্ষেত্রে জবানের উপস্থিতি সরাসরি না থাকলেও তা যে মূলত জবান দিয়ে বলারই নামান্তর, বিষয়টি আমরা খুব কম মানুষই মনে রাখি।

ভার্চুয়াল জগতে মন চাইলেই যে কাউকে নিয়ে আমরা ব্যঙ্গ করি। হাতে কিবোর্ড আছে। লেখার জন্য আছে পর্যাপ্ত জায়গা। সুতরাং অন্যজনের ইজ্জতের ওপর ধারালো কুড়াল মারার আগে দ্বিতীয়বার ভাববার প্রয়োজনবোধ করি না। আমরা ভুলে যাই নবীজি (ﷺ) সতর্ক করে বলেছেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَخُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

‘এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। সে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে না। তার সাথে মিথ্যা বলে না। তাকে অসম্মান করে না। প্রত্যেক মুসলিমের সম্মান, সম্পদ ও রক্ত অন্য মুসলিমের ওপর হারাম। তাকওয়া তো এখানে (অন্তরে)। কোনো ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে।’<sup>৬</sup>

আমাদের কর্মকাণ্ড দেখে মনে হয় এসব হাদীস কেবল আমাদের বাস্তব জীবনের জন্যই প্রযোজ্য। ভারুয়াল জীবনে এর কানাকড়ি মূল্যও নেই। যদি সত্যিই থাকত তবে কেন দুই জগতে আমাদের ব্যক্তি-জীবনের অবস্থা ভিন্নরকম?

সালাফে সালাহীন জবানকে বড় ভয় করতেন। একবার উমর (রাঃ) দেখলেন, আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) জিহ্বা বের করে দিয়ে তা হাত দিয়ে টেনে ধরেছেন। উমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, আপনি কী করছেন?’ জবাবে তিনি বললেন, ‘এটাই আমাকে ধ্বংসের স্থানে নিক্ষেপ করেছে।’<sup>৭</sup>

আবুদ দারদা (রাঃ) বলেছেন, ‘মুমিন ব্যক্তির শরীরে এমন কোনো অঙ্গ নেই যা আল্লাহ তাআলার কাছে তার জিহ্বার তুলনায় অধিক প্রিয়, জিহ্বার কারণে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আর কাফেরের শরীরে এমন কোনো অঙ্গ নেই যা আল্লাহ তাআলার কাছে তার জিহ্বা থেকে ঘৃণ্য, জিহ্বার কারণে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।’<sup>৮</sup>

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাঁর পুত্রকে বলেছেন, ‘হে বৎস, তোমার ঘরই যেন তোমার জন্য যথেষ্ট হয়। তুমি তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখো এবং তোমার পাপের কথা মনে করে কাঁদো।’

জবানের হেফাজতের এসব নির্দেশনার ক্ষেত্র চামড়ার চোঁট আর নরম গোশতের তৈরি জিহ্বার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কুরআন-হাদীস ও সাহাবী-

৬. তিরমিযী: ১৯২৭

৭. আহমাদ বিন হাম্বল (রাঃ), কিতাবু যুহুদ: ৫৮০

৮. আহমাদ বিন হাম্বল (রাঃ), কিতাবু যুহুদ: ৭৫০



সালাফদের বাণীকে ব্যাপকাথেই বুঝতে হবে। এর মধ্যে মনের ভাব প্রকাশের যেকোনো মাধ্যমই অন্তর্ভুক্ত হবে। চাই সেটা মুখের বলা হোক কিংবা কাগজ-কিবোর্ডের লেখা হোক। এই নির্দেশনাগুলো এভাবে না বুঝলে এ সকল নির্দেশনার যথাযথ হক আদায় করা সম্ভব হবে না।

ইমাম নববী (رحمہ اللہ) ছিলেন হিজরী সপ্তম শতকের একজন মহান বিদ্বান। হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রে রয়েছে তাঁর অসামান্য অবদান। তাঁর রচিত *কিতাবুল আযকার* থেকে জবানের অধ্যায়কে চয়ন করে প্রস্তুত করা হয়েছে বাংলায় *জবানের হেফাজত* নামক বইটি। বিষয়বস্তু বিবেচনায় বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে বইটির হক আদায় করে পাঠ করার জন্য পাঠককে অবশ্যই এতে বর্ণিত আলোচনার পরিধিকে আরও বিস্তৃত আকারে দেখতে হবে, যেমনটা ওপরে আমি বলে এসেছি। প্রতিটি আয়াত-হাদীস ও সালাফদের বক্তব্যগুলো পাঠকালে থেমে থেমে বর্তমান সময়-চিত্র ও নিজের অবস্থার সাথে একে মিলিয়ে নিয়ে তারপর সামনে বাড়তে হবে। এভাবে পাঠ করতে পারলে আশা করি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা বইটিকে কবুল করে নিন। ফিতনার এই যামানায় জবানের ব্যাপারে আমাদের সতর্কতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বইটিকে উসিলা বানান। সম্মানিত অনুবাদক, প্রকাশকসহ যারাই বইটি প্রকাশের পেছনে কোনো-না-কোনোভাবে সময় ও শ্রম দিয়েছেন তাদের সকলকে যথাযথ বিনিময় দান করুন। আমীন।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

২১ ফিলহজ, ১৪৩৯

২ সেপ্টেম্বর, ২০১৮



## অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا مُّوَافِيًا لِّنِعَمِهِ , مُكَافِيًا لِّمَزِيدِهِ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ  
خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের পাক দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া যে, তিনি তার সীমাহীন দয়া ও মেহেরবানি দ্বারা এই অনভিজ্ঞ, অধম ও অযোগ্য বান্দাকে তাঁর দ্বীনের খিদমাত করার সুযোগ দিয়েছেন।

জগদ্বিখ্যাত দ্বীনি ও ইলমী ব্যক্তিত্ব ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া নববী (رحمته)-এর অনবদ্য গ্রন্থ আল আযকারের 'হিফজুল লিসান' অংশটুকুর সরল বাংলা অনুবাদ জবানের হেফাজত পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা রব্বের কারীমের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। পাশাপাশি এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে এর উত্তম বিনিময়ের আশায় বুক বেঁধে বসে আছি।

অনুবাদের জগতে আমি যে নতুন এবং একেবারেই আনকোরা, তা বইটি হাতে নিয়ে বিজ্ঞ পাঠকমাত্রই উপলব্ধি করতে পারবেন। তদুপরি বর্তমান সময়ের দাবি অনুযায়ী এ ধরনের বই-পুস্তকের অতীব প্রয়োজনীয়তা কারও পক্ষেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। বর্তমান সামাজিক ও অন্তর্জালিক জীবনে আমাদের ভাষার ব্যবহারে যে নৈতিক ধস পরিলক্ষিত হচ্ছে তা এককথায় ভয়াবহ। আমরা নিজেদের মুখনিঃসৃত বাক্য ও লেখনী ইত্যাদি দ্বারা নিজেদের চিন্তা-ভাবনাকে যেভাবে প্রকাশ করে চলেছি, তার অধিকাংশই কুরআন-সুন্নাহ ও পূর্ববর্তী পুণ্যবানগণের প্রদর্শিত আদর্শ হতে কক্ষচ্যুত।

এমতাবস্থায় বাকসংঘমের ব্যাপারে আমাদের সামনে পূর্ববর্তী ও সর্বজনগৃহীত কোনো মনীষীর দিক-নির্দেশনা থাকা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

ইমাম নববী (رحمته)-এর লেখনী সর্বজনগৃহীত। দ্বীন ও দ্বীনি ইলমের প্রতি তাঁর নিবেদন আমাদের জন্য বিস্ময়কর ও ঈর্ষণীয়। তাই বাকসংঘমের

মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে তাঁর মতো সালাফ হতে নির্দেশনা নিতে পারাটা আমাদের জন্য সৌভাগ্যই বটে।

‘হিফজুল লিসান’ অধ্যায়ের অনুবাদ করার জন্য আমি যোগ্য ব্যক্তি নই। অনুবাদ করতে গিয়ে পদে পদে আমি তা উপলব্ধি করতে পেরেছি। তাই অনুবাদের আনন্দ ছাপিয়ে আমলহীন বক্তা হওয়ার শঙ্কা আমাকে পেয়ে বসেছে। এ ক্ষেত্রে আমি মহান আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের দয়া ও অনুগ্রহ আর পাঠকের দুআর ভিখারি।

বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে আমরা যে সকল বই-পুস্তক ও তথ্যসূত্রের সাহায্য গ্রহণ করেছি তা সংক্ষেপে ভূমিকায় উল্লেখ করে দেওয়া সমীচীন মনে করছি।

১. অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা মূল যে আরবী কপিটি সামনে রেখে কাজ করেছি তা কায়রোর ‘দারুল হাদীস’ প্রকাশনী হতে প্রকাশিত ও আব্দুর রহমান সবাবিতি কর্তৃক সম্পাদিত। পাশাপাশি দারে ইবনে হাজারের কপি থেকেও প্রচুর তথ্য নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও কখনো কখনো মাওলানা নিছার আহমদ কাসিমী অনূদিত আল আযকারের উর্দু অনুবাদেও চোখ বুলিয়েছি।

২. পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের অনুবাদ নেওয়া হয়েছে মুফতী শফী (رحمہ اللہ) লিখিত ও মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (رحمہ اللہ) কর্তৃক অনূদিত মা‘আরিফুল কুরআন হতে।

৩. হাদীসসমূহের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও তাওহীদ প্রকাশনীসহ কওমী মাদরাসায় প্রচলিত অনুবাদ গ্রন্থাবলি থেকে সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

৪. টীকায় উল্লেখিত হাদীস ও বিভিন্ন বই-পুস্তকের তথ্যসূত্রগুলো মূল আরবী কপি থেকে নেওয়া।



সর্বাত্মক চেষ্টার পরও মানবিক সীমাবদ্ধতার দরুন কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তবে নিশ্চিতরূপেই এর সবটুকু দায় আমার। তাই তথ্য-উপাত্ত বা মুদ্রণজনিত কোনো ভুল থাকলে পাঠকের নিকট তা শুধরে দেওয়ার বিনীত নিবেদন রইল।

অসামান্য এ গ্রন্থটির অনুবাদের কাজে যাদের আন্তরিক সহযোগিতা আমাকে প্রতিনিয়ত কৃতজ্ঞতাপার্শ্বে আবদ্ধ করেছে, তাদের নাম উল্লেখ করতে পারলে খুব ভালো লাগত। কিন্তু আল্লাহ তাআলার এ সকল মুখলিস বান্দা ও বান্দিগণকে আল্লাহ তাআলা পার্থিব পরিচিতি ও সাধুবাদের পরীক্ষায় নিপতিত না করে আখিরাতের চিরসাফল্যে সম্মানিত করুন, এটাই আমার চাওয়া। দ্বীনের এই সামান্য খিদমাতের দ্বারা আল্লাহ তাআলা এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের আখিরাত সুন্দর করে দিন। আমীন।

আহমাদ ইউসুফ শরীফ

দারুস সালীম মাদরাসা

মাস্টারপাড়া, উত্তরখান, ঢাকা-১২৩০।

৩০/১২/১৪৩৯ হিজরী মোতাবেক

১১/০৯/২০১৮ ইসায়ী

## ইমাম নববী (ﷺ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইমাম নববীর পূর্ণ নাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শারফ আন নাওয়াউই। তিনি আন নাওয়াউই, ইমাম নাওয়াউই বা এ অঞ্চলে ইমাম নববী নামে প্রসিদ্ধ। ইমাম নববী মুহররম ৬৩১ হিজরী মোতাবেক অক্টোবর ১২৩৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪ রজব ৬৭৬ হিজরী মোতাবেক ২১ ডিসেম্বর ১২৭৭ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জন্ম হয় বর্তমান সিরিয়ার নাওয়াতে, এ জন্য তাঁর নামে নাওয়াকে সম্পৃক্ত করে নাওয়াউই লেখা হয়। নাওয়া শহরটি বর্তমান সিরিয়ার দারা প্রদেশের ইযরা জেলায় অবস্থিত। এই শহর হযরত নূহ (ﷺ)-এর সন্তান শাম-এর কবরস্থান হিসাবে প্রসিদ্ধ।

ইমাম নববী (ﷺ) একাধারে মুহাদ্দিস, ফকীহ, অভিধানকার ও জীবনীকার। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, আকীদায় আশআরী। তিনি শাফেয়ী মাযহাবে আবরাযুল ফুকাহাদের<sup>১</sup> একজন হিসাবে বরিত এবং শাফেয়ী মাযহাবে তাঁকে শাইখ উপাধিতে স্মরণ করা হয়। শাফেয়ী ফিকহের কিতাবাদিতে ‘শাইখাইন’ শব্দের উল্লেখ থাকলে তা দ্বারা ইমাম আবুল কাসিম আর রাফিঈ আল কাযউইনী এবং ইমাম নববীকে বোঝানো হয়ে থাকে।

### লকব

ইমাম নববী (ﷺ)-এর লকব বা উপাধি ছিল ‘মুহিউদ্দীন’ বা দ্বীনের পুনরুজ্জীবন দানকারী, কিন্তু তিনি এ লকব ব্যবহার করতে অপছন্দ করতেন। কেননা, দ্বীন সব সময়ই জীবিত একে পুনরুজ্জীবিত করার কিছু নেই।

১. ‘আবরাযুল ফুকাহা’ বলতে সেসব ফকীহদের বোঝানো হয় যারা মাযহাবের ভেতর যেসব মাসাইলে মতপার্থক্য থাকে সেসবের কোনোটাকে প্রাধান্য দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন।



## কুনিয়াত

তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু যাকারিয়া অর্থাৎ যাকারিয়ার পিতা। ইমাম নববী (رحمہ) যদিও চিরকুমার ছিলেন তবুও এই কুনিয়াত গ্রহণ করেছিলেন। প্রাবন্ধিক মুহাম্মাদ দাউদ আল খাত্তাবীর মতে কুনিয়াত গ্রহণ সুন্নাহ বিধায় চিরকুমার ইমাম নববী (رحمہ) কুনিয়াত গ্রহণ করেছিলেন। যেমন : এক হাদিসে রয়েছে, উম্মুল মুমিনিন আয়শা (رضی) বলেছেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّ نِسَائِكَ لَهَا كُنْيَةٌ غَيْرِي

“ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি ছাড়া আপনার প্রত্যেক স্ত্রীরই কুনিয়াত রয়েছে।”<sup>১০</sup>

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে বললেন,

أَكْتَنِي بِإِنِّكَ عَبْدُ اللَّهِ يُغْنِي ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنْتِ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ

“আমি তোমার সন্তান আব্দুল্লাহ” অর্থাৎ ইবনুয যুবাইরের (নাম) অনুযায়ী তোমার কুনিয়াত দিচ্ছি যে তুমি হচ্ছে উম্মু আদিল্লাহ (বা আব্দুল্লাহর মা)।”

এরপর থেকে আমৃত্যু তাঁকে উম্মু আদিল্লাহ হিসাবেই ডাকা হয়।<sup>১১</sup>

## শিক্ষাজীবন

ইমাম নববীর (رحمہ) শিক্ষা অর্জন শুরু হয় তাঁর পিতার নিকট। তিনি সে সময় বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্য প্রচলিত ‘কাতাতিবে’ পড়াশোনা করেন। কৈশোরে পদার্পণ করার পূর্বেই ইমাম নববী কুরআনের হিফয সম্পন্ন করেছিলেন। ১৮ বছর বয়সের পূর্ব পর্যন্ত তিনি নাওয়াতেই অবস্থান করেন। অতঃপর ৬৪৯ হিজরীতে ইলম অর্জনের জন্য দামেস্কে যাত্রা করেন।

১০. যেহেতু তাঁর সন্তান ছিল না।

১১. বোনের ছেলেকেও সন্তান বলা হয়, আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (رحمہ) ছিলেন আয়শা (رضی)-এর বোন আসমা (رضী)-এর সন্তান।

১২. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (رحمہ), আল মুসনাদ: ৬/১৫১; আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (رحمہ), সিলসিলাতুস সহীহা: ১/২৫৫, হা: ১৩২; সনদ সহীহ



দামেস্কে তিনি প্রথমে আল জামিউল উমুওয়ির নিকট 'রাওয়াহিয়া' মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন। তখন ইলম অর্জনই তাঁর প্রধান কাজ ছিল। তিনি দিনে ১২টি দরসে অংশ নিতেন। নিজের সম্পর্কে ইমাম নববী (رحمہ) বলেছেন,

“এর সাথে (দরসের সাথে) সম্পৃক্ত সবকিছু আমি লিখে নিতাম, তা সেটা কঠিন শব্দের বিশ্লেষণই হোক বা বাক্যের বিশ্লেষণ হোক। আর আব্দাহ সে সময় আমার ওপর তাঁর রহমত নাযিল করেছিলেন।”<sup>১০</sup>

### শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম নববী সেকালে সেরা আলেমদের মধ্যে ২০ জনের অধিক উস্তাদের নিকট থেকে ইলম অর্জন করেন। তিনি তাঁদের থেকে ইলমুল আরাবিয়াহ, ফিকহ, হাদিস, উসূল প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন।

### ফিকহে তাঁর উস্তাদ ছিলেন :

১. তাজুদ্দীন ফায়ারী
২. আবু হাফস উমার আল ইরবিলী
৩. আবুল হাসান সালাম আদ দামিশকী

### তাঁর হাদিসের উস্তাদগণ :

১. যাইনুদ্দীন আবুল বাকা খালিদ বিন ইউসুফ
২. আর রিদ্দা ইবনুল বুরহান
৩. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয আল আনসারী
৪. আবু ইসহাক ইবরাহীম আল আন্দালুসী আশ শাফেয়ী
৫. আবু ইসহাক ইবরাহীম আল ওয়াসিতী

১০. শাযারাতুয যাহাব: ৫/৩৫৫

### ইলমুল উসুলের উস্তাদগণ :

১. আল্লামা আল কাযি আবুল ফাতহ উমার আশ শাফেয়ী

### আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের উস্তাদগণ :

১. আশ শাইখ আবুল আব্বাস আহমাদ আল মিসরী আন নাহউই
২. আল্লামা আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দিল্লাহ

### যেসব উল্লেখযোগ্য কিতাব উস্তাদ থেকে শ্রবণ করেছেন

সহীহুল বুখারী, সহীহুল মুসলিম, সুনানু আবি দাউদ, সুনানুত তিরমিযি, সুনানুন নাসাঈ, মুওয়াত্তা, মুসনাদু ইমাম আশ শাফেয়ী, মুসনাদু ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, সুনানুদ দারিমী, মুসনাদু আবি আওয়ানাহ, মুসনাদু আবি ইয়া'লা, সুনানু ইবনে মাজাহ, সুনানুদ দারাকুতনী, সুনানুল বাইহাকী, শরহুস সুন্নাহ, মাআলিমুত তানযিল (তাফসিরের কিতাব), কিতাবুল আনসাব, রিসালাতুল কুশাইরী, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাহ, আদাবুস সামি ওয়ার রাউই।

### তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রবৃন্দ

১. আলাউদ্দীন আবুল হাসান আলী আদ দামিশকী, তিনি ইবনুল আত্তার নামে পরিচিত
২. আশ শিহাব মুহাম্মাদ বিন আব্দিল খালিক আল আনসারী
৩. আল ফাকীহ আবুল আব্বাস আহমাদ আল ওয়াসিতী
৪. আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে ইবরাহীম
৫. আশ শামস মুহাম্মাদ বিন আবি বার
৬. আল বাদার মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম
৭. আবুল আব্বাস আহমাদ আল ইশবিলী



### কর্মজীবন

ইমাম নববী (رحمہ) শিক্ষকতা শুরু করেন মাদরাসাতুল ইকবালিয়াতে। অতঃপর মাদরাসাতুল ফালাকিয়াহ ও রুকনিয়াতে শিক্ষকতা করেন। তিনি দামেস্কে দারুল হাদিস আল আশরাফিয়াহতে ৬৬৫ হিজরী সনে নিযুক্ত হন এবং ৬৭৬ হিজরী পর্যন্ত তাতে কর্মরত ছিলেন। ইমাম নববী সেখানে দারুল হাদিসের শাইখ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উনার পূর্বে এই পদে আসীন ছিলেন ইমাম তাকিউদ্দীন ইবনুস সালাহ ও শিহাবুদ্দীন আবু শামাহ আল মাকদিসী (رحمہ)।

### বৈবাহিক অবস্থা

ইমাম নববী চিরকুমার ছিলেন। ইলমসাধনায় নিমগ্ন এই সাধক ইলমের ওপর বিয়েকে প্রাধান্য দিতে পারেননি।

### রচনাবলি

ইমাম নববী (رحمہ) তাঁর স্বল্প আয়ুষ্কালে বিপুলসংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য কিতাব লিখেছেন। বিষয়ভিত্তিকভাবে তাঁর কিতাবগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

#### ইলমুল হাদিস :

১. শরহ মুসলিম
২. রিয়াযুস সলিহীন মিন কালামি সাযিদিলা মুরসালিন
৩. আল আরবাউনান নাওয়াউইয়্যাহ
৪. খুলাসাতুল আহকাম
৫. শরহুল বুখারী (অসম্পূর্ণ)
৬. আল আযকার
৭. আল ইরশাদ ওয়াত তাকরিব ওয়াল ইশারাত ইলা বায়ানিল আসমাইল মুবহামাত
৮. আত তাকরিব ওয়াত তাইসির
৯. ইরশাদু তালাবিল হাকাইক

### ফিকহ :

১. রাউযাতুত তালিবীন আল মাজমুউ শারহিল মুহাযযাব (অসম্পূর্ণ)
২. আল ইয়াহ ফিল মানাসিক

### তারবিয়াহ ও সুলুক :

১. আত তিবইয়ান ফি আদাবি হামানাতিল কুরআন
২. বুস্তানুল আরিফীন

### জীবনীগ্রন্থ :

১. তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত
২. তাবাকাতুল ফুকাহা

### ভাষা-বিষয়ক :

১. আল কাসমুস সানী মিন তাহযিবিল আসমা ওয়াল লুগাত
২. আত তাহরীর ফি আল-ফাযিত তাম্বিয়াহ

### পরহেজগারি ও দুনিয়াবিমুখী জীবন

ইমাম নববী (رحمہ) অত্যন্ত পরহেজগারির জীবনযাপন করতেন, এমনকি এ জন্য তিনি দামেস্কের কোনো ফল খেতেন না। কেননা, এসব ফলগাছের অধিকাংশ ছিল ওয়াকফকৃত অথবা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, যা খাওয়া জায়েজ ছিল না। এ ঘটনা ইমাম ইবনে কাসির, ইবনুল আত্তার, যাহাবী ও সাখাবী (رحمہ) উল্লেখ করেছেন।

ওনার ব্যাপারে ইমাম ইবনুল আত্তার (رحمہ) বলেছেন, আমাদের শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দিল কাদির আল আনসারী (رحمہ) বলেছেন, “যদি (তাসাওউফের বিখ্যাত কিতাব) আর রিসালাহ-এর লেখক কুশাইরী (رحمہ) তোমাদের শাইখ (ইমাম নববী) বা তাঁর শাইখ (ইমাম আবু ইসহাক আল মাগরিবী)-কে পেতেন, তাহলে তাঁদের বাদ দিয়ে অপর কোনো শাইখেরই উল্লেখ করতেন না; কেননা, তাঁদের উভয়ের মাঝে ইলম, আমল, যুহদ,



পরহেজগারি, প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা ও অন্যান্য (সকল উত্তম গুণ) জমা হয়েছিল।”<sup>১৪</sup>

## মৃত্যু

ইমাম নববী (رحمۃ اللہ علیہ) তাঁর জন্মভূমি নাওয়াতে ফিরে আসার পর ৬৭৬ হিজরীতে মারা যান। তিনি তাঁর শাইখদের কবর যিয়ারত করেন, তাঁদের জন্য দুআ করেন ও কান্নাকাটি করেন, অতঃপর বন্ধুবান্ধব ও পিতার কবর যিয়ারত করেন। এরপর বাইতুল মাকদিস যিয়ারাত করে নাওয়াতে ফিরে আসেন। অতঃপর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ২৪ রজব মারা যান।

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি অশেষ রহম করুন এবং গোটা মুসলিম জাতির পক্ষ থেকে জাযায়ে খাইর দান করুন।

লেখক : মানযুরুল করীম

১৪. ইমাম শামসুদ্দীন সাখাভী (رحمۃ اللہ علیہ), আল মানহালুল আযাবির রাউই, পৃ: ১১

ইমাম নববীর জীবনী লিখতে যে সকল ওয়েবসাইটের সাহায্য নেওয়া হয়েছে:

১) shazly.com, article: ترجمة الامام النووي

২) marefa.org, article: يحيى بن شرف النووي

৩) ar.wikipedia.org, article: يحيى بن شرف النووي

৪) en.wikipedia.org, article: Al-Nawawi

৫) whatisquran.com, article: Biography of Imam an Nawawi Rahimahullah

৬) islamstory.com/ar, article: الإمام النووي .. حياة مع العلم

৭) alukah.net, article: العطر الشذي من ترجمة الإمام النووي



## জবানের হেফাজত

আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝

“সে (মানুষ) যা-ই উচ্চারণ করে, তা-ই গ্রহণ (সংরক্ষণ) করার জন্য তার নিকট রয়েছে সদা প্রস্তুত প্রহরী।”<sup>১৫</sup>

তিনি আরও বলেন :

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ ۝

“নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।”<sup>১৬</sup>

ইমাম নববী (رحمہ اللہ) বলেন, ‘আল্লাহ তাআলার দেওয়া তাওফিকে এবং তিনি সহজ করে দেওয়ায় ইতিপূর্বে আমি “মুস্তাহাব” তথা পছন্দনীয় বিষয়াবলির আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ে আমি অপছন্দনীয় ও নিষিদ্ধ তথা মাকরুহ ও হারাম কথাবার্তার আলোচনা করতে চাই, যেন এ গ্রন্থটি শব্দ ও বাক্যের ব্যবহারিক বিধান এবং এর প্রকারভেদ নির্ণয়ে সামগ্রিক ভূমিকা রাখে। এতে আমি এমন কিছু বিষয়ের আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি, প্রতিটি দ্বীনদার ব্যক্তির জন্য যা জানা আবশ্যিক। এবং এর অধিকাংশ বিষয়ই সর্বজনবিদিত। তাই এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ দলিল-প্রমাণই আমি উপস্থাপন করিনি। ওয়া বিল্লাহিত-তাওফিক।

১৫. সূরা কাক, ৫০ : ১৮

১৬. সূরা ফাযর, ৮৯ : ১৪

## উত্তম কথা ব্যতীত অন্য কথা হতে

### জবানকে হেফাজত করা

প্রতিটি দ্বীনদার ব্যক্তির জন্যই সকল বিষয়ে নিজের জিহ্বা তথা ভাষার ব্যবহারকে সংযত রাখা অত্যন্ত জরুরি। শুধু কল্যাণকর বিষয়েই তার ব্যবহার হতে পারে। এমনকি কল্যাণলাভের বিচারে যদি কথা বলা বা না-বলা উভয়ই সমান হয়, তবে সে ক্ষেত্রেও নীরব থাকাই সুন্নাত। কেননা, স্বাভাবিক জায়েজ কথাবার্তাও ক্ষেত্রবিশেষে মানুষকে মাকরুহ ও হারামের দিকে ধাবিত করার আশঙ্কা রাখে; বরং অভ্যাসবশত অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুলের আশঙ্কাই প্রবল। আর তখন কোনো কিছুই শান্তি বয়ে আনতে পারে না।

০১. আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ-দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।’<sup>১</sup>

ইমাম নববী (رحمته الله) বলেন, হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের ঐকমত্য এ কথার অকাট্য প্রমাণ যে, কারও জন্য এমন কথা বলা উচিত নয়, যাতে ভালো বা কল্যাণকর কিছু নেই। অর্থাৎ স্পষ্ট কল্যাণ নিশ্চিত হলেই কথা বলবে। নতুবা কল্যাণের ব্যাপারে সন্দিহান হলেও কথা বলবে না।

ইমাম শাফেয়ী (رحمته الله) বলেন, ‘মানুষ যখন কথা বলতে চায়, তখন তার উচিত আগে ভেবে নেওয়া। যদি স্পষ্টত কল্যাণকর হয়, বলবে; আর যদি সন্দেহ হয়, তাহলে স্পষ্ট কল্যাণ না দেখা পর্যন্ত কথা বলবে না।’

১৭. বুখারী: ৬১৩৬; মুসলিম: ৪৭



০২. আবু মুসা আশআরী (رضي الله عنه) বলেন,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ  
‘আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ),’ কোন মুসলমান উত্তম? তিনি  
বললেন, যার জিহ্বা ও হাত হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ।’”

০৩. সাহল বিন সাদ (رضي الله عنه) রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন,

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

‘যে ব্যক্তি আমার জন্য দুই চোয়াল আর দুই রানের মধ্যবর্তী বস্তুর  
(জিহ্বা ও লজ্জাস্থান হেফাজতের) দায়িত্ব নেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের  
দায়িত্ব নেব।’”

০৪. আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) বলেন, তিনি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَبَيِّنُ فِيهَا يَرِلُّ بِهَا إِلَى النَّارِ أَبَدًا مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ  
وَالْمَغْرِبِ

নিশ্চয় বান্দা কখনো এমন কথা বলে ফেলে, যার পরিণাম সে চিন্তা করে  
না। অথচ এ কথার কারণে সে জাহান্নামের এমন গভীরে নিক্ষিপ্ত হবে,  
যার দূরত্ব পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব পরিমাণ।”

বুখারীর বর্ণনায় উক্ত হাদীসটিতে পশ্চিম শব্দটির উল্লেখ নেই। এখানে ‘  
بَيْنَ فِيهَا’ দ্বারা এমন কথা উদ্দেশ্য, যার ভালো-মন্দ যাচাই করা হয় না।

০৫. আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যে,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يُلْقِي لَهَا بِالْأَلَى، يَرْفَعُ اللَّهُ  
تَعَالَى بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُلْقِي  
لَهَا بِالْأَلَى يَنْهَوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ

১৮. বুখারী: ১১; মুসলিম: ৪১, ৪২

১৯. বুখারী: ৬৪৭৪

২০. বুখারী: ৬৪৭৭; মুসলিম: ২৭৮৮

বান্দা কখনো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিমূলক এমন কথা বলে ফেলে যার গুরুত্ব সে নিজেও অনুধাবন করতে পারে না। অথচ এ কারণে আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। এমনভাবে বান্দা কখনো আল্লাহ তাআলার ক্রোধোদ্দীপক এমন কথা বলে ফেলে, যার গুরুত্ব সে নিজেও অনুধাবন করতে পারে না। অথচ এ কারণে সে জাহান্নামে নিষ্কিণ্ড হয়।”

০৬. বেলাল বিন হারেস মাজুনী (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى مَا كَانَ يُظَنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى مَا كَانَ يُظَنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ"

‘মানুষ কখনো কখনো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিমূলক এমন কথা বলে দেয় যার চূড়ান্ত সীমা সম্পর্কে সে কোনোরূপ ধারণা রাখে না। অথচ এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা সাক্ষাৎ-দিবস (কিয়ামত) পর্যন্ত তার প্রতি সন্তুষ্টি লিখে দেন। এমনভাবে মানুষ কখনো আল্লাহ তাআলার অসন্তোষমূলক এমন কথা বলে দেয় যার চূড়ান্ত সীমা সম্পর্কে সে কোনো ধারণা রাখে না। অথচ এ কারণে আল্লাহ তাআলা সাক্ষাৎ-দিবস পর্যন্ত তার প্রতি অসন্তুষ্টি লিখে দেন।’

ইমাম তিরমিযী (رحمته الله) বলেন, ‘হাদীসটি হাসান সহীহ।’

০৭. সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ (رحمته الله) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ، قَالَ: " قُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ، ثُمَّ اسْتَقِمْ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكْثَرُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِلِسَانِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: "هَذَا"

২১. বুখারী: ৬৪৭৮

২২. তিরমিযী: ২৩১২; ইবনে মাজাহ: ৩৯৬২; মুয়াত্তা ইমাম মালিক: ১৮৪৮



‘আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাকে এমন একটি বিষয় বাতলে দিন যা আমি দৃঢ়ভাবে ধারণ করব।’ তিনি বললেন, ‘তুমি বলো যে, আল্লাহ আমার প্রতিপালক আর এ কথার ওপর দৃঢ়পদ থাকো।’ আমি বললাম, ‘আমার মধ্যকার আশঙ্কাজনক বিষয়াবলির মধ্যে সবচেয়ে আশঙ্কাজনক কোনটি?’

তিনি নিজের জিহ্বা মুবারক ধরে বললেন ‘এটি।’<sup>২৩</sup>

ইমাম তিরমিযী (رحمہ اللہ) বলেন ‘হাদীসটি হাসান সহীহ।’

০৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (رضی اللہ عنہ) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الْقَلْبُ الْقَاسِي"

‘তোমরা আল্লাহ তাআলার জিকির ব্যতীত অন্য কথা বেশি বোলো না। কেননা, আল্লাহর জিকির ব্যতীত অন্য কথার আধিক্য মূলত অন্তরের কাঠিন্য (এর কারণ হয়)। আর মানুষের মধ্যে কাঠিন-হৃদয় লোকেরা আল্লাহ থেকে বেশি দূরের হয়।’<sup>২৪</sup>

০৯. আবু হুরাইরা (رضی اللہ عنہ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি,

"مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ"

আল্লাহ যাকে দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু (জিহ্বা) এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী বস্তুর (লজ্জাস্থান) ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’<sup>২৫</sup>

ইমাম তিরমিযী (رحمہ اللہ) বলেন, ‘হাদীসটি হাসান।’

২৩. আবু দাউদ: ২৪১০; ইবনে মাজাহ: ৩৯৭২; দারেমী: ২৭১১

২৪. তিরমিযী: ২৪১১

২৫. তিরমিযী: ২৪০৯

১০. উকবা বিন আমের (رضي الله عنه) বলেন,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: أَمْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلَيْسَعُكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ.

আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল, মুক্তি কিসের মধ্যে?’

তিনি বললেন, নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখো, তোমার ঘর যেন তোমার জন্য প্রশস্ত হয় (বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেয়ো না) আর নিজের ভুলের জন্য ক্রন্দন করো।”<sup>২৬</sup>

ইমাম তিরমিযী (رحمته الله) বলেন, ‘হাদীসটি হাসান।’

১১. আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكْفِّرُ اللِّسَانَ فَيَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنْ اسْتَقَمَّتْ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اغْوَجَّتْ اغْوَجْنَا"

‘মানুষ যখন ভোরে জাগ্রত হয় তখন তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিহ্বাকে মিনতি করে বলে, ‘আমাদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় করো। কেননা, আমাদের ব্যবহার তোমারই সাথে জড়িত। তুমি সুস্থির (ঠিক) থাকলে আমরা সুস্থির (ঠিক) থাকব। আর তুমি বেঁকে গেলে আমরাও বেঁকে যাব।’”<sup>২৭</sup>

১২. উম্মে হাবীবা (رضي الله عنها) রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন,

"كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ، إِلَّا أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ، وَنَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى"

আদমসন্তানের প্রতিটি কথাই তার বিপক্ষে হয়; পক্ষে নয়। তবে সৎ কাজের নির্দেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ অথবা আল্লাহর জিকির ব্যতীত (এগুলো তার পক্ষে নয়)।<sup>২৮</sup>

২৬. তিরমিযী: ২৪০৬

২৭. তিরমিযী: ২৪০৭

২৮. তিরমিযী: ২৪১২; ইবনে মাজাহ: ৩৯৭৩



১৩. মুআজ বিন জাবাল (ؓ) বলেন,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيْسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسْرُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ قَالَ: ثُمَّ ثَلَا تَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، حَتَّى بَلَغَ 'يَعْمَلُونَ'، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَخْبِرُكَ بِمَلَاكٍ ذَلِكَ كُلُّهُ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَتَاحِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ

আমি আরয করলাম, 'ইয়া রাসূলান্নাহ, আমাকে এমন কোনো আমল বাতলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ कराবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।'

রাসূল (ﷺ) বললেন, 'তুমি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করেছে। আল্লাহ তাআলা যার জন্য এ বিষয়টি সহজ করে দেবেন তার জন্য তা খুবই সহজ।

এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করো যে, তাতে কাউকে শরিক কোরো না। নামাজ কায়েম করো। জাকাত আদায় করো। রমজানের রোজা রাখো। বাইতুল্লাহর হজ করো।'

অতঃপর বললেন, 'আমি কি তোমাকে সকল কল্যাণের প্রবেশদ্বার সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হলো, রোজা ঢালস্বরূপ। সদকা গুনাহকে

এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমন আগুন পানিকে। আর মানুষের মধ্যরাতের নামাজ।' অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

تَنَجَّانِي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ' وَ مِنَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ۝ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ' جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

'তাদের পার্শ্বশয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি যে রিযিক তাদের দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের বিনিময়ে কী কী নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে।' (সূরা সিজদা, ৩২ : ১৬-১৭)

অতঃপর বললেন, 'আমি কি তোমাকে আমলের ভিত্তি, তার খুঁটি এবং শীর্ষ-চূড়া সম্পর্কে অবহিত করব না?'

আমি নিবেদন করলাম, 'অবশ্যই হে আম্মাহর রাসূল, আপনি অবশ্যই বলুন।'

তিনি বললেন, 'এর ভিত্তি হলো ইসলাম। খুঁটি হলো নামাজ। আর শীর্ষ-চূড়া হলো জিহাদ।'

অতঃপর তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাকে এসবের মূল ভিত্তি সম্পর্কে জানাব না?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ (বলুন), ইয়া রাসূলাম্মাহ।'

তিনি তাঁর জিহ্বা মুবারক ধরে বললেন, 'একে আয়ত্তে রেখো।'

আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাম্মাহ, আমরা যা বলে থাকি তাতেও কি আমাদের জবাবদিহিতা তলব করা হবে?'

তিনি বললেন, 'সন্তানহারা হোক তোমার মা (আক্ষেপসূচক বাক্য), জিহ্বার পরিণতি বৈ অন্য আর কী আছে, যা মানুষকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে?'



ইমাম তিরমিযী (رحمہ اللہ) বলেন, 'হাদীসটি হাসান সহীহ।'

হাদীসে 'وَرَوَى' 'যিরওয়াতুন' শব্দের অর্থ চূড়া বা সর্বোচ্চ স্তর।

১৪. আবু হুরাইরা (رضی اللہ عنہ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"مَنْ حُسِّنَ إِسْلَامُ الْمَرْءِ تَزَكَّى مَا لَا يَغْنِيهِ"

'মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হলো তার অনর্থক কথাবার্তা পরিত্যাগ করা।'<sup>৩০</sup>

ইমাম তিরমিযী (رحمہ اللہ) বলেন, 'হাদীসটি হাসান।'

১৫. আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (رضی اللہ عنہ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেন,

"مَنْ صَمَتَ نَجَا"

'যে চুপ থাকল, সে মুক্তি পেল।'<sup>৩১</sup>

ইমাম নববী (رحمہ اللہ) বলেন, 'এই হাদীসটির সনদ যঈফ তথা দুর্বল। তদুপরি আমি তা এখানে উল্লেখ করতে চেয়েছি, কারণ এটি খুব প্রসিদ্ধ।'

ইমাম নববী (رحمہ اللہ) বলেন, 'এই অধ্যায়ে আমার উল্লেখিত হাদীসের মতো এ বিষয়ক আরও অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। আল্লাহ তাআলা যাকে তাওফিক দেবেন, তার জন্য উল্লেখিত পরিমাণ হাদীসই যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ। বাকি আরও কিছু অংশ (হাদীস ও আলোচনা) সামনে গীবতের অধ্যায়ে উল্লেখ করব। আল্লাহ যদি তাওফিক দান করেন।

চলমান (কল্যাণকর কথা) বিষয়ে পূর্বসূরি সালাফ ও অন্যান্যদের অনেক আলোচনা রয়েছে। হাদীস উল্লেখ করার পর সেসব উল্লেখ করা জরুরি মনে করছি না। তদুপরি সালাফের কিছু চুম্বক অংশ এখানে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি।

৩০. তিরমিযী: ২৩১৭; ইবনে মাজাহ: ৩৯৭৬; মাজমুআতুয যাওয়াইদ: ৮/৮১

৩১. তিরমিযী: ২৫০১

একবার কুসসা বিন সাঈদাহ ও আকছাম বিন সাইফী (রাঃ) একত্র হলেন। তাঁদের একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি আদমসন্তানের মধ্যে কী পরিমাণ দোষ খুঁজে পেয়েছেন?'

অন্যজন বললেন 'এ তো গণনার চেয়েও বেশি। তবে আমি গণনা করে আট হাজার দোষ খুঁজে পেয়েছি। আর মানুষের মধ্যে এমন একটি অভ্যাসও আমি পেয়েছি যা চর্চা করলে তার সব দোষ গোপন থাকবে।'

প্রথমজন জানতে চাইলেন, 'সেটি কী?'

দ্বিতীয়জনের উত্তর, 'জবানের হেফাজত তথা ভাষার সংযত ব্যবহার।'

ফুজাইল বিন আয়াজ (রাঃ) বলেন,

وَمَنْ عَدَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ فِيمَا لَا يَنْفَعُهُ

'যে ব্যক্তি তার আমলের মধ্যে কথাকে গণনা করবে, তার অনর্থক কথা বলার পরিমাণ কমে যাবে।'<sup>৩২</sup>

ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) তার শিষ্য রবী বিন সুলাইমান মুরাদী (রাঃ)-কে বলেন,

يَا رَبِيعُ لَا تَتَكَلَّمُ فِيمَا لَا يَغْنِيكَ فَإِنَّكَ إِذَا تَكَلَّمْتَ بِالْكَلِمَةِ مَلَكَتْكَ وَلَمْ تَمْلِكْهَا

'রবী, অনর্থক কথা বলবে না। তুমি যখন কথা বলো তখন এর দায় তোমার ওপর বর্তায়, কথার ওপর নয়।'

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন,

مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَقُّ بِطُولِ السَّجْنِ مِنَ اللِّسَانِ

'জিহ্বার চেয়ে অধিকতর বন্দীযোগ্য আর কিছু নেই।'<sup>৩৩</sup>

অন্যান্য আলেম বলেন,

مَثَلُ اللِّسَانِ مَثَلُ السَّبْعِ إِنْ لَمْ تُوثِقْهُ عَدَا عَلَيْكَ

৩২. রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ: ১/২৫০। কিতাবুস সমতি ওয়া আদাবুল লিসান (ইবনু আবিদ দুনিয়া রাঃ), ৩৫।

৩৩. আয যুহুদু লি ইবনিল মুবারক, ৩৮৪।



জিহ্বা হলো হিংস্র প্রাণীর মতো, যদি একে বেঁধে না রাখো তবে সে তোমার প্রতি আক্রমণোন্মুখ হবে।<sup>৩৪</sup>

গ্রন্থকারের উস্তাদ আবুল কাসিম কুশাইরী (رحمہ اللہ) তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তিকা *রিসালাতুল কুশাইরিয়াহ*-তে বর্ণনা করেছেন, চুপ থাকাই নিরাপদ এবং এটাই মূল কথা। যথাসময়ে নীরবতা অবলম্বনই বীরোচিত স্বভাব। ঠিক যেমন উপযুক্ত সময়ে কথা বলাটা উত্তম গুণ।

তিনি আরও বলেন, 'আমি আবু আলী দাক্কাক (رحمہ اللہ)-কে বলতে শুনেছি, হক বিষয়ে যে চুপ থাকে সে হলো বোবা শয়তান। তিনি আরও বলেন, 'দুনিয়াবিমুখ সাধনা ও আত্মসংশোধনে ব্রত সাধকগণ নীরবতাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। কারণ, অতিকথনের বিপদ ও অশুভ পরিণতি সম্পর্কে তারা যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন।

তারা তাঁদের কথাবার্তায় অন্তরের ভূমিকা সম্পর্কেও জ্ঞান রাখেন। আর এতে উত্তম চরিত্রের কতটুকু প্রকাশ পায় তারও হিসাব রাখেন। তা ছাড়া সুবচন ইত্যাদি দ্বারা অন্যের ওপর বক্তার প্রাধান্য পাওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। যা অনেক ক্ষেত্রেই বিপদের কারণ হয়। (যেমন : অহংকার ও রিয়া ইত্যাদি মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়)।<sup>৩৫</sup>

কথাবার্তায় এ ধরনের (সজাগ ও সতর্ক) অবস্থান সাধকগণের প্রধান বৈশিষ্ট্য, চারিত্রিক সৌন্দর্য এবং অর্জিত মর্যাদার অন্যতম অংশ।

এ বিষয়ে জনৈক কবি চমৎকার লিখেছেন,

أَحْفَظْ لِسَانَكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ \*\*\* لَا يَلْدَغَنَّكَ إِنَّهُ تُغْبَانُ  
كَمْ فِي الْمَقَابِرِ مِنْ قَتِيلٍ لِسَانِهِ \*\*\* قَدْ كَانَ هَابَ لِقَاءِ الشُّجْعَانِ

সংযত রেখো জিহ্বা তোমার ওহে,  
এ সাপ যেন দংশে না কভু তোমায়।  
দংশনে তার কবরে আজিকে হয়,  
কতশত বীর পরাজিত কাতরায়।

৩৪. *রিসালাতুল কুশাইরিয়াহ*: ১/২৪৯।

৩৫. *রিসালাতুল কুশাইরিয়াহ*: ১/২৪৫ শামেলা ভার্সন। (অনুবাদক)

ইমাম আবুল ফজল আল আব্বাস ইবনুল ফারাজ রিয়াশী (رحمہ اللہ) বলেন,

لَعَمْرُكَ إِنَّ فِي ذَنْبِي لَشُغْلًا \*\*\* لِنَفْسِي عَنْ ذُنُوبِ بَنِي أُمِّيهِ  
عَلَى رَبِّي حِسَابُهُمْ إِلَيْهِ \*\*\* تَنَاهَى عِلْمُ ذَلِكَ لَا إِلَهَ  
وَلَيْسَ بِضَائِرِي مَا قَدْ أَتَوْهُ \*\*\* إِذَا مَا اللَّهُ أَصْلَحَ مَا لَدَيْهِ

দোহাই বলছি পাপের বোঝা আমায়,  
ভুলিয়েছে বনু উমাইয়া কী করেছে কোথায়  
তার হিসাব যে রয়েছে প্রভুর পাশে,  
আমি তো নই বইবে সে তার দায়  
তার এসবে আমার কীই-বা ক্ষতি,  
শুধরে দিলে জিভটুকু মোর খোদায়।

(তোমাকে আমার কসম দিয়ে বলছি, আমার গুনাহের দুচ্চিন্তা আমাকে বনু উমাইয়ার পাপাচার সম্পর্কে উদাসীন করে দিয়েছে। তার হিসাব তো আমার রবের কাছে রয়েছে। তার ইলম তারই ওপর উপসংহার টানবে, আমার প্রতি নয়। সে যা করেছে তা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তবে আমার নিকট যা আছে (জিহ্বা) আল্লাহ যদি তা সংশোধন করে দেন তবে আমি বেঁচে যাই।)\*\*\*

### গীবত ও কুৎসা রটনা (চোগলখুরি) হারাম

মনে রাখবেন উল্লেখিত অভ্যাস দুটি মানুষের বদ অভ্যাসসমূহের অন্যতম। মানুষের মাঝে এ দুটির প্রচলনও ব্যাপক। খুব কম মানুষই এসব থেকে নিবৃত্ত থাকে। সামগ্রিক প্রয়োজন ও পরিত্যাগের গুরুত্ব বিবেচনায় গীবতের আলোচনা দিয়েই এ অধ্যায় শুরু করছি।

৩৬. দারু ইবনিল হাজাম প্রকাশিত নুসখার টিকায় লিখেছেন যে, কারও কারও মতে পঙ্ক্তি দুটি ইমাম শাফেয়ী (رحمہ اللہ)-এর। মাইদানী (رحمہ اللہ) মজমাউল আমহাল গ্রন্থের ২/২৪ পাঠে এ মত ব্যক্ত করেছেন। এ ছাড়াও আল কামিল ও আল ওয়াফি গ্রন্থদ্বয়ে পঙ্ক্তি দুটি যথাক্রমে রয়েছে। (অনুবাদক)



## গীবত

মানুষের মধ্যে বিদ্যমান দোষ বা দুষণীয় এমন কোনো বিষয় তার অবর্তমানে আলোচনা করা, যার উল্লেখ তার অপছন্দনীয়, একেই গীবত বলা হয়। চাই উল্লেখিত দোষটির সম্পর্ক তার শরীর, দ্বীন, দুনিয়া, মানসিকতা, আকৃতি, চরিত্র, সম্পদ, সন্তান, মাতাপিতা, স্ত্রী, চাকর-বাকর, পাগড়ি, পোশাক, চলাফেরা, ওঠা-বসা, আমোদ-ফুর্তি, অনৈতিকতা, নির্লজ্জতা ও যথেচ্ছাচার বা অন্য যেকোনো কিছুর সাথেই থাকুক না কেন। এসবের আলোচনা আপনি মুখে বলে, লিখে, মাথা দুলিয়ে, হাত দিয়ে, চোখের ইশারায় বা অন্য যেকোনো উপায়েই করুন না কেন, তা গীবত। গ্রন্থকার এসবের কিছু নমুনা তুলে ধরেছেন।

শারীরিক দোষের আলোচনা : যেমন কাউকে অন্ধ, ল্যাংড়া, কানা, টেকো, খাটো, লম্বু, কালো, হলদে ইত্যাদি বলা।

দ্বীন দোষ : যেমন কাউকে ফাসেক, চোর, খিয়ানতকারী, অত্যাচারী, নামাজে অলস, পাক-নাপাকের ব্যাপারে উদাসীন, পিতামাতার অবাধ্য, হকদারকে জাকাত প্রদান করে না, গীবত ছাড়ে না ইত্যাদি বলা।

দুনিয়াবি দোষ : যেমন কাউকে বেআদব, অবজ্ঞাকারী, অন্যের অধিকার বোঝে না, বাচাল, পেটুক, নিদ্রাকাতর, অসময়ে ঘুমায়, অপাত্রে উঠে-বসে ইত্যাদি বলা।

পিতামাতা সম্পর্কিত দোষ : যেমন কারও পিতাকে তার পিতা ফাসেক, ভারতীয়, ভিস্তি, নিগ্রো, পশুপালক, মুচি, পোশাক ফেরিওয়ালা, পশু-বিক্রেতা, কাঠমিস্ত্রি, কামার বা তাঁতি ইত্যাদি বলা।

চারিত্রিক দোষ : যেমন কাউকে দুশ্চরিত্র, অহংকারী, ঝগড়াটে, তাড়াহুড়াপ্রবণ, স্বেচ্ছাচারী, অক্ষম, দুর্বল-হৃদয়, অবিবেচক, রুঢ়, নির্লজ্জ ও লম্পট ইত্যাদি বলা।

পোশাকের দোষ : যেমন কারও পোশাক সম্পর্কে চওড়া আস্তিন, দীর্ঘ আঁচল বা নোংরা পোশাক পরিধানকারী ইত্যাদি বলা।

এমনিভাবে অন্য বিষয়গুলো অনুমান করে নেওয়া সহজ।

মূল বিষয় হলো যেগুলোর আলোচনা করা মানুষ অপছন্দ করে তা-ই গীবত। তবে অপছন্দ না করলে তা গীবত নয়।

ইমাম আবু হামিদ গাজালী (رحمہ اللہ) বলেন, ‘মুসলমানদের সর্বসম্মত মত এই যে, গীবত হলো অন্যের এমন আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে।’<sup>৩৭</sup>

এ-সম্পর্কিত প্রামাণ্য হাদীসসমূহ সামনে আসছে।

### চোগলখুরি বা কুৎসা রটনা

#### বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একের কথা অন্যকে বলা

এ তো পরনিন্দা ও কুৎসা রটনার পরিচয়।

আর এ দুটির বিধান হলো—উম্মতের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ দুটি হারাম।

এ দুটির হারাম হওয়ার প্রমাণ কুরআন, হাদীস ও ইজমায় সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُمُ بَعْضًا

তোমরা আড়ালে অন্যের দোষচর্চা করো না।<sup>৩৮</sup>

তিনি আরও বলেন :

وَيَلْ لَّكَ هَمَزَةٌ لِّمَنَّا

প্রত্যেক ছিদ্রাশ্বেষী অভিসম্পাতকারীর জন্য ধ্বংস অনিবার্য।<sup>৩৯</sup>

তিনি আরও বলেন :

هَمَّا زِمْنَا مَشَاءَ بَنِييْمِ

যে পশ্চাতে নিন্দা করে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে ফেরে।<sup>৪০</sup>

৩৭. ইহইয়াউ উলুমুদ দ্বীন: ৩/১৪৩

৩৮. সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১২

৩৯. সূরা হুমাজাহ, ১০৪ : ১

৪০. সূরা কলম, ৬৮ : ১১



১৬. হুযাইফা (رضي الله عنه) রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,  
"لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَامٌ"

‘চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’<sup>৪১</sup>

১৭. আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে,  
مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: "أَمَّا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ"

রাসূল (ﷺ) দুটি কবরের পাশ দিয়ে গেলেন। এমন সময় তিনি বললেন,  
‘এদের দুজনের শাস্তি হচ্ছে। আর তাদের আজাব বড় কোনো কারণে  
হচ্ছে না।’

বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, এর পরে রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ

তবে তা খুবই বড় (গর্হিত) বিষয়। তাদের একজন চোগলখুরি করত আর  
অন্যজন প্রস্রাব হতে বেঁচে থাকত না (প্রস্রাবের ছিটা হতে বা প্রস্রাব-  
পরবর্তী পবিত্রতা হতে)।<sup>৪২</sup>

ইমাম নববী (رحمته الله) বলেন, উলামায়ে কেরাম বলেন, ‘তাদের বড় কোনো  
কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না’ কথার ব্যাখ্যা এই যে, বিষয় দুটি তাদের  
কাছে বড় কিছু মনে না হলেও আব্দুল্লাহ তাআলার নিকট তা বড় বিষয়  
ছিল। অথবা এ কথার এমন অর্থও হতে পারে যে, বিষয় দুটি এমন বড়  
কিছু ছিল না যে তা ছাড়া যেত না; বরং তা পরিত্যাগ করা খুবই সহজ  
ছিল। এতৎসত্ত্বেও তারা এগুলো পরিত্যাগ না করে শাস্তির উপযুক্ত  
হয়েছে।

৪১. বুখারী: ৬০৫৫; মুসলিম: ১০৫

৪২. বুখারী: ২১৬; মুসলিম: ২৯২

১৮. আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেন,

"أَتَذُرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟" قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ"  
قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: "إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدْ  
اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ"

‘তোমরা কি জানো গীবত কী?’ সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) বললেন ‘আম্মাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) ভালো জানেন।’

তিনি বললেন, ‘গীবত হলো তুমি তোমার ভাইয়ের এমন আলোচনা করলে, যা সে অপছন্দ করে।’

বলা হলো, ‘আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থেকে থাকে, তাহলে কী মনে করেন?’

রাসূল (ﷺ) বললেন, ‘তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে পাওয়া যায় তবেই সেটি গীবত হবে। আর যদি তুমি যা বলছ তা তার মধ্যে পাওয়া না যায় তবে তো তুমি তার নামে অপবাদ রটালে।’<sup>৪৩</sup>

১৯. আবু বাকরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَنَى فِي حَجَّةِ  
الْوَدَاعِ: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ  
هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟"

রাসূল (ﷺ) বিদায় হজের সময় মিনাতে কুরবানীর দিন তার খুতবায় ফরমান : ‘তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জত-আব্রু তোমাদের পরস্পরের জন্য এই শহরে এই মাসে এই দিনের মতোই হারাম। সাবধান! আমি কি পৌঁছে দিইনি?’<sup>৪৪</sup>

৪৩. মুসলিম: ২৫৮৯; সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৭৪; তিরমিযী: ১৯৩৪; তুহফাতুল আশরাফ: ১৩৯৮৫ (সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ীর সূত্রে)

৪৪. বুখারী: ১০৫; মুসলিম: ১৬৭৯



২০. আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ: تَغْنِي قَصِيرَةً، فَقَالَ: "لَقَدْ قُلْتَ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ" قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا، فَقَالَ: "مَا أَحَبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا"

‘আমি রাসূল (সঃ)-কে বললাম, ‘সাফিয়াহ (রাঃ)-এর এমন এমন হওয়া আপনার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত।’

কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেন, এ কথার দ্বারা আয়িশা (রাঃ) তার খর্বাকৃতিকে বুঝিয়েছেন।

এ কথা শুনে রাসূল (সঃ) বললেন, ‘তুমি এমন কথা বলেছ যে, তা যদি সমুদ্রের পানিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়, সমুদ্রের পানির স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে।’

আয়িশা (রাঃ) আরও বলেন, ‘আমি রাসূলের সামনে এক ব্যক্তির আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, ‘আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমি কারও সম্পর্কে কিছু বলি আর আমলনামায় এত এত (গুনাহ) লেখা হোক।’<sup>৪৫</sup>

ইমাম তিরমিযী (রাঃ) বলেন, ‘হাদীসটি হাসান সহীহ।’

ইমাম নববী (রাঃ) বলেন, ‘مَزَجَتْ’ ‘মাযাজাত’ অর্থ মেলানো। তবে এখানে এমনভাবে মেলানোর অর্থে ব্যবহার হয়েছে যেভাবে মিশ্রণের দ্বারা বস্তুর স্বাদ ও গন্ধে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। আর এই পরিবর্তনের কারণে শব্দটির অত্যধিক নিকৃষ্ট হয়ে সীমাহীন দুর্গন্ধময় হয়ে ওঠা বোঝায়। যদ্বরূন এমন শব্দ সংযুক্ত একটি বাক্যই পুরো সমুদ্রের পানিকে নোংরা ও দুর্গন্ধময় করে দিতে পারে। এই উদাহরণের দ্বারা মানুষকে ছোট করার নিমিত্তে ব্যবহৃত শব্দের অত্যধিক কলুষিত হওয়ার অনুমান করা যেতে পারে।

গীবত থেকে বাধাদান ও তার ভয়াবহতা বর্ণনায় এই হাদীসের ভূমিকা অপরিসীম ও গুরুত্বপূর্ণ। আমার জানামতে এ বিষয়ে এর চেয়ে কঠিন হাদীস আর নেই।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ

‘তিনি নিজ থেকে কিছুই বলেন না। এসব তো তার প্রতি প্রেরিত ওহী।’<sup>৪৬</sup>

আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ এবং সকল অপছন্দনীয় বিষয় হতে মার্জনা কামনা করি।

২১. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘রাসূল (ﷺ) বলেন,

لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَزْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نَحَاسٍ يَخْمُسُونَ وُجُوهَهُمْ  
وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ، قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ  
النَّاسِ، وَيَقْعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ

আমাকে যখন মিরাজে নিয়ে যাওয়া হলো তখন আমি এমন একদল মানুষের পাশ দিয়ে গেলাম, যাদের নখ ছিল তামার। আর তারা তা দিয়ে নিজেদের চেহারা ও বুক আঁচড়াচ্ছিল। আমি বললাম, জিবরীল, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা ওই সমস্ত লোক, যারা মানুষের গোশত খেতো (গীবত করত) আর তাদের মানহানিতে লিপ্ত থাকত।<sup>৪৭</sup>

২২. সাঈদ বিন জায়েদ (رضي الله عنه) রাসূল (ﷺ) এর এরশাদ নকল করেন, রাসূল (ﷺ) বলেন,

"إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا إِسْتِطَالََةً فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ"

‘নিকৃষ্টতম সুদ হলো অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানের সম্মান নষ্ট করা।’<sup>৪৮</sup>

৪৬. সূরা নাজম, ৫৩ : ৩-৪

৪৭. আবু দাউদ : ৪৮৭৮

৪৮. আবু দাউদ : ৪৮৭৬



২৩. আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَخُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ"

এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তার ব্যাপারে মিথ্যা বলবে না, তাকে অসম্মান করবে না। প্রত্যেক মুসলমানের সম্মান, সম্পদ ও রক্ত অন্য মুসলমানের ওপর হারাম। তাকওয়া এখানে (অন্তরে)। কোনো ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে।<sup>৪৯</sup>

ইমাম তিরমিযী (رحمته الله) বলেন, 'হাদীসটি হাসান।'

গ্রন্থকার বলেন, 'আমি বলি যে, হাদীসটি কতই-না ব্যাপক অর্থবহ এবং সীমাহীন কল্যাণকর। ওয়া বিল্লাহিত তাওফিক।

### গীবতের সংজ্ঞা ও পরিধি সম্পর্কিত কিছু জরুরি বিষয়

পূর্বের অধ্যায়ে বলা হয়েছে, গীবত কারও এমন দোষ-গুণ বা অভ্যাসের আলোচনা করা যা সে অপছন্দ করে। চাই তা বলে, লিখে বা চোখ, হাত, মাথা কিংবা অন্য কোনো অঙ্গ দ্বারা ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমেই হোক না কেন। মোদাকথা, যেকোনো উপায়ে অপর মুসলমানকে হেয় করা নিষিদ্ধ গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

উদাহরণস্বরূপ কারও ব্যাপারে এ কথা বলা যে, সে খুঁড়িয়ে, পা টেনে বা অন্য কোনোভাবে চলাফেরা করে। আর এ কথার দ্বারা যদি তাকে হেয় করা উদ্দেশ্য হয়, তবে কোনোরূপ মতানৈক্য ছাড়াই তা হারাম। তেমনিভাবে কোনো লেখক যদি তার লেখায় কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা

হেয় করার মানসে কোনো অবস্থা তুলে ধরে, তবে তাও হারাম। তবে কারও ভুল ধরিয়ে দিয়ে জনমানুষকে তার ভ্রান্ত অনুসরণ থেকে নিবৃত্ত রাখা বা কোনো ব্যক্তির জ্ঞানস্বল্পতা ও দুর্বলতা তুলে ধরে মানুষকে তার ধোঁকা থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কোনো আলোচনা করলে তা গীবত নয়; বরং তা প্রয়োজনীয় উপদেশ ও হিতকামনা বলেই বিবেচিত হবে। আর উদ্দেশ্য যদি এমন মহৎ কিছুই হয়ে থাকে, তবে তার জন্য যথোপযুক্ত বিনিময় ও পুণ্যও রয়েছে।

অনুরূপভাবে কোনো গ্রন্থকার যদি তার গ্রন্থে লেখেন, ‘একটি গোত্র বা একটি দলের মতামত এরূপ, আর তা ভিত্তিহীন ও ভুল বা মূর্খতা, অজ্ঞতা ও উদাসীনতা’, তবে তাও গীবত হবে না। কেননা, এ ধরনের কথা তখনই গীবত বলে সাব্যস্ত হবে যখন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলের ব্যাপারে বলা হবে।

এবং এ ধরনের কথাবার্তা বলাও গীবত যে, ‘কিছু লোক, কিছু ফিকাহবিদ, ইলমের দাবিদার কতিপয় ব্যক্তি, সুফীসাধক দাবিদার কিছু লোক বা আমার নিকট আগতদের কিছু কিংবা আমি যাদের প্রতি লক্ষ রেখেছিলাম তাদের কেউ কেউ এমনটা করেছে।’ অথবা এমন বাক্য ব্যবহার করা যদরূন শ্রোতা তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলে যে, কার ব্যাপারে কথা বলা হচ্ছে। এ সবকিছুই হারাম।

এমনকি বিদগ্ধ বিদ্বান ও ইবাদতপ্রাণ ব্যক্তির অন্যকে তুচ্ছ বা হেয় করার মানসে সবিনয় ও ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্যব্যয়ও হারাম গীবতেরই অন্তর্ভুক্ত।

এ সকল মান্যবর ব্যক্তিবর্গ বিনয়ের সাথে এমন-সব পরচর্চাসুলভ কথা বলে থাকেন যা শ্রোতাসাধারণ স্পষ্ট ভাষায় পরচর্চার মতোই উপলব্ধি করতে পারেন।

যেমন : কাউকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘অমকের কী অবস্থা?’ বলেই তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহ আমাদের সংশোধন করুন বা আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন বা আল্লাহ তাকে শুধরে দিন বা আমরা আল্লাহর অনুকম্পা



কামনা করি বা আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি যে তিনি আমাদের অত্যাচারীর দরবারে আসা-যাওয়ায় লিপ্ত করেননি বা আল্লাহ আমাদের নির্লজ্জতা থেকে রক্ষা করুন বা আমরা আল্লাহর নিকট সকল মন্দ কাজ হতে পরিত্রাণ কামনা করি, তিনি আমাদের তওবা কবুল করুন ইত্যাদি। অথবা এমন কোনো কথা বলা, যদারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির তুচ্ছ বা হয়ে হওয়া স্পষ্ট হয়ে যায়, এ সবই গীবত এবং হারাম।

এ ছাড়াও এমন কথা বলা যে, অমুক তো এমন বিষয়ে জড়িয়ে পড়েছে যাতে আমরাও জড়িত, কিংবা এ কথা বলা যে, এ কারণেই তার সম্পদ তার জন্য ফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে অথবা এ কথা বলা যে আমরা সবাই এমনটা করে থাকি ইত্যাদি। এ ধরনের বিনয়ের মাধ্যমে অন্যকে বিদ্ধ করার সূক্ষ্ম প্রয়াসও গীবতেরই অংশ।

এ সবই সামান্য উদাহরণমাত্র। মূলত একের কাছে অন্যকে নিন্দনীয় হিসাবে তুলে ধরাটাই গীবত যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর গীবতের সংজ্ঞা ও পরিধি সম্পর্কিত এ সবকিছুই আমরা পূর্বে উল্লেখিত ১৮ নং হাদীস থেকে অনুধাবন করতে পেরেছি। হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

### গীবত করা ও শোনা উভয়ই হারাম

এ কথা মনে রাখা আবশ্যিক যে, গীবত করা যেমন হারাম, তা শোনা এবং একে সত্যায়ন করাও হারাম। অতএব যখনই কেউ কারও গীবত শুরু করে তখন কোনোরূপ ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে তৎক্ষণাৎ তাকে বাধা দেওয়া উচিত। আর যদি কোনোরূপ আশঙ্কা থাকে তবে অন্তর থেকে তা অস্বীকার করা চাই। সেই সাথে সম্ভব হলে এ ধরনের বৈঠক ত্যাগ করা উচিত। তেমনিভাবে মৌখিকভাবে গীবতে বাধা দেওয়ার সামর্থ্য থাকলে বা কোনোভাবে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার সুযোগ থাকলে তা করা আবশ্যিক। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বাধা না দিলে গুনাহগার হবেন।

আর যদি কেউ মুখে মুখে গীবত বন্ধের উপদেশ দিলেও মনে মনে তা অব্যাহত রাখার অভিলাষ পোষণ করে, এমন ব্যক্তির ব্যাপারে ইমাম আবু হামিদ গাজালী (رحمہ اللہ) বলেন, ‘তার এই কাজ স্পষ্ট নিফাক। আর সে কোনোভাবেই গুনাহমুক্ত নয়।’<sup>৫০</sup>

বরং তার উচিত হলো মুখে মুখে বাধাদানের পাশাপাশি অন্তর থেকেও একে মন্দ মনে করা। এমনিভাবে কেউ যদি গীবতের বৈঠকে বসতে বাধ্য হয়, যেখানে সে বাধাদানে বা অমত প্রকাশে অপারগ হয় কিংবা তার বাধা ও অমতকে গ্রাহ্য না করা হয় আর তার পক্ষে সেখান থেকে উঠে আসা সম্ভব না হয়, তদুপরি তার জন্য এ ধরনের গীবতে কান দেওয়া বা মনোযোগ দিয়ে শোনা জায়েজ নয়।

এ ধরনের অপ্রীতিকর অবস্থায় এসব থেকে বেঁচে থাকার উপায় হলো মুখে ও অন্তরে একান্তে আল্লাহর জিকির করা। এবং অন্য কোনো বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করা। যাতে গীবতের কথায় তার মন না বসে, আর সেও তা না শুনে। এড়িয়ে যাওয়ার যাবতীয় চেষ্টা সত্ত্বেও যদি কিছু গীবত তার কর্ণগোচর হয়েই যায়, এতে আর তার ওপর দায় বর্তাবে না।

তবে গীবতের আড্ডা চলমান অবস্থায় যখনই কেউ বৈঠক ত্যাগের সুযোগ লাভ করে তৎক্ষণাৎ এ ধরনের বৈঠক ত্যাগ করা চাই।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ  
وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾

‘আর আপনি যখন তাদের দেখেন যারা আমার আয়াতসমূহে ছিদ্রাশ্বেষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়। আলোচনায় মগ্ন হয়, আর শয়তান যদি আপনাকে ভুলিয়ে



দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর জালিম সম্প্রদায়ের সাথে উপবেশন করবেন না।<sup>৫১</sup>

ইবরাহীম আদহাম (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে, একবার তিনি একটি ওলিমার অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে যান। সেখানে লোকেরা একজনকে নিয়ে কথা বলছিল যিনি তখনো সেখানে উপস্থিত হননি।

কিছু লোক বলল, 'আরে সে তো স্থূল প্রকৃতির।'

এ কথা শুনে ইবরাহীম আদহাম (ﷺ) বললেন, 'আমি নিজের প্রতি এই অন্যায় করেছি যে, এমন জায়গায় উপস্থিত হয়েছি যেখানে অন্যের গীবত হচ্ছে।' এ কথা বলে তিনি সেখান থেকে না খেয়েই বেরিয়ে গেলেন এবং পরবর্তী তিন দিন পর্যন্ত কিছু খাননি।<sup>৫২</sup>

আবুল হাসান ইবনুল হারিস হাশিমী (ﷺ) এমন কিছুই বলেছেন :

وَسَمْعَكَ صُنْ عَنْ سَمَاعِ الْقَبِيحِ \*\*\* كَصَوْنِ اللِّسَانِ عَنِ النُّطْقِ بِهِ

فَإِنَّكَ عِنْدَ سَمَاعِ الْقَبِيحِ \*\*\* شَرِيكَ لِقَائِلِهِ فَانْتَبِهْ

মন্দ কথায় কান পেত না বেঁচে থাকো বরং,

যেমনভাবে জিহ্বাটাকে বাঁচিয়ে রাখো খুব

মন্দ কথায় কান পাতা যে বলার মতোই পাপ,

তাই সাবধানে তুমি বেঁচে থেকো খুব।<sup>৫৩</sup>

### গীবত ত্যাগের বর্ণনা

কুরআন এবং সুন্নাহতে গীবত ত্যাগ করার অসংখ্য উপায় বাতলে দেওয়া আছে এবং এর দলিল-প্রমাণও বিস্তর। তবে এখানে আলোচনাকে এর কিয়দংশেই সংক্ষিপ্ত রাখতে হচ্ছে। কেননা, আল্লাহ যাকে তাওফিক

৫১. সূরা আনআম, ৬ : ৬৮

৫২. দারে ইবনে হাজাম হতে প্রকাশিত নুসখায় এ ঘটনার উদ্ধৃতি হিসাবে রিসালাতুল কুশাইরিয়া : ১/৫০৮ উল্লেখ করেছেন। তবে শামেলা ভার্সনে : ১/২৪৯ ভিন্ন শব্দে এ ধরনের কথা পাওয়া যায়।

৫৩. আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দীন, (মাওয়াযদী ﷺ), ২৯২।

দেবেন তিনি এতটুকুতেই গীবত থেকে বিরত থাকতে পারবেন। আর যিনি এর ব্যত্যয় হবেন, তিনি তো ভূরি ভূরি গ্রন্থেও নিবৃত্ত হবার পাত্র নন। আর এ ক্ষেত্রে উত্তম প্রস্তাব তো এই যে, মানুষ কুরআনের সে সকল অকাট্য প্রমাণাদি নিজের সামনে রাখবে, যা গীবত হারাম হওয়ার আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলার পবিত্র বাণী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ⑤

‘সে যা কিছু উচ্চারণ করে, তা-ই সংরক্ষণ করার জন্য তার নিকটে রয়েছে একজন সতর্ক প্রহরী।’<sup>৫৪</sup>

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ⑥

‘তোমরা একে হালকা মনে করলেও আল্লাহর নিকট তা বিশাল।’<sup>৫৫</sup>

আর ০৫ নং হাদীসকেও সামনে রাখা উচিত। যেখানে বলা হয়েছে যে, ‘বান্দা কখনো কখনো আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক এমন কথা বলে ফেলে যার মর্ম সে নিজেও অনুভব করতে পারে না আর এর ফলে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়।’

এ ছাড়াও ইতিপূর্বের আলোচনায় এমন অনেক হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি এ কথাও স্মরণ রাখা যে, আল্লাহ আমার সাথে আছেন, তিনি আমাকে দেখছেন এবং তিনি আমার সম্পর্কে অবগত আছেন।

হাসান বসরী (رحمه الله)-এর ব্যাপারে কথিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি তাকে বললেন, ‘আপনি আমার গীবত করেন!’<sup>৫৬</sup>

৫৪. সূরা হাফ, ৫০ : ১৮

৫৫. সূরা নূর, ২৪ : ১৫

৫৬. ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন, ৩/১৪৮



তিনি বললেন, ‘আমার নিকট তোমার মর্যাদা এতটা সুউচ্চ নয় যে, তোমার জন্য আমি আমার পুণ্য জলাঞ্জলি দেবো।’

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (رضي الله عنه) বলেন,

لَوْ كُنْتُ مُغْتَابًا أَحَدًا لَأَغْتَبْتُ وَالِدَيَّ لِأَنَّهُمَا أَحَقُّ بِحَسَنَاتِي

‘আমি যদি কারও গীবত করতাম তবে আমার পিতা-মাতার গীবত করতাম। কেননা, তারাই আমার আমলের সর্বাধিক হকদার।’<sup>৫৭</sup>

### বৈধ এবং হালাল গীবতের বর্ণনা

গীবত সাধারণত হারাম হলেও কল্যাণকর কিছু পাওয়া গেলে ক্ষেত্রবিশেষ তা বৈধ ও হালালও বটে। শরীয়তসম্মত সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কখনো কখনো গীবতকে হালাল করে দেয়। যখন গীবত ছাড়া ব্যক্তি বা দলের ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি ও সত্যতা তুলে ধরা অসম্ভব ও জটিল হয়ে যায়। তখন তা জায়েজ হয়ে যায়। গ্রন্থকারের মতে (জায়েজ গীবত) এর ছয়টি ভাগ রয়েছে :

(১) মাজলুম তথা নিপীড়িত ব্যক্তির জন্য তার ওপর চলা জুলুমকে বন্ধ করার জন্য বাদশাহ, বিচারক বা ন্যায়বিচার প্রদানে সক্ষম ব্যক্তির নিকট অত্যাচারের বিবরণ প্রকাশ করা জায়েজ। অর্থাৎ তার জন্য এ কথা বলা জায়েজ আছে যে, ‘অমুক আমার ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে বা এই এই করেছে বা আমার অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে বা বলপূর্বক আমার নিকট হতে এই বস্তু নিয়ে নিয়েছে ইত্যাদি।

(২) কাউকে তার বদ অভ্যাস বা দূষণীয় বিষয় থেকে রক্ষা করে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে অন্য কারও সাহায্য নেওয়ার উদ্দেশ্যে গীবত করা জায়েজ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অভিযুক্তকে তার মন্দাচার থেকে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম, তার কাছে এ কথা বলা যাবে যে, ‘অমুকের কার্যকলাপ এ রকম, তাকে একটু সতর্ক করে দিন ইত্যাদি। তবে এসব শুধু তাকে তার নিষিদ্ধ

৫৭. রিসালাতুল কুশাইরিয়াহ: ১/২৯২।

ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যেই হতে হবে। তা না হলে হারাম গীবত হবে।

(৩) ফতোয়া গ্রহণের উদ্দেশ্যে গীবত করা। যেমন মুফতি সাহেবের কাছে এ কথা বলা যে, আমার পিতা, ভাই বা অমুক আমার প্রতি অন্যায় আচরণ করেছে। এমন করা কি তাদের জন্য জায়েজ আছে? আর এ থেকে আমার পরিত্রাণের পথই-বা কী?

এবং আমি কীভাবে আমার অধিকার পেতে পারি? সেই সাথে এই অন্যায়কে কীভাবে নির্মূল করতে পারি? অথবা এভাবেও বলতে পারে যে, আমার স্ত্রী আমার সাথে এরূপ আচরণ করে বা আমার স্বামী আমার সাথে এরূপ আচরণ করে। এ সবই মূলত নেহায়েত প্রয়োজন বলেই জায়েজ। তবে এ ক্ষেত্রেও সতর্কতামূলক নাম উল্লেখ না করে অনির্দিষ্টভাবে বলাই উত্তম। যেমন এমন ব্যক্তির ব্যাপারে আপনি কী বলেন, যে কিনা এমন এমন কাজ করেছে। অথবা কোনো স্বামী-স্ত্রীর আচরণ এ রকম ইত্যাদি। এতে করে নাম উল্লেখ না করে অনির্দিষ্টভাবেই উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। এতৎসত্ত্বেও সমাধান লাভের উদ্দেশ্যে কেউ যদি নাম উল্লেখ করতে চায়, তবে তাও জায়েজ আছে। আর এর দলিল হলো আবু সুফিয়ান (رضي الله عنه)-এর স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা (رضي الله عنها)-এর হাদীস। যেখানে তিনি রাসূল (ﷺ)-এর নিকট নিজের স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করেন, আবু সুফিয়ান খুবই কৃপণ প্রকৃতির মানুষ। আর রাসূল (ﷺ) তাকে এমন অভিযোগ প্রকাশে নিষেধও করেননি।<sup>৫৮</sup>

(৪) মুসলমানদের কারও ক্ষতি থেকে রক্ষা করা ও তাদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে কারও গীবত করা জায়েজ। আর এর জন্য কয়েকটি পন্থাও রয়েছে: ক) হাদীস বর্ণনাকারী রাবী বা সাক্ষ্য দানকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে মূলনীতি ও শরীয়তসম্মত কোনো অভিযোগ থাকলে তা সকলকে অবহিত করা সর্বসম্মতভাবে শুধু জায়েজই নয়; বরং ওয়াজিব।

৫৮. বুখারী: ৫৩৫৯; মুসলিম: ১৭১৪



খ) কেউ যদি কারও সাথে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে বিবাহ, চুক্তি বা আমানত ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ কামনা করে, তবে প্রথম ব্যক্তির কর্তব্য হলো তৃতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে সে যা জানে, সতর্ক করার উদ্দেশ্যে পরামর্শ কামনাকারীকে তা অবহিত করা। তবে এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দোষ উল্লেখ না করে ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্যে যদি উদ্দেশ্য হাসিল হয়, তবে তা-ই করা চাই। যেমন : এ কথা বলা, তার সাথে লেনদেন করাটা ঠিক হবে না বা এখানে আত্মীয়তা করা সমীচীন হবে না বা তার সাথে এ ধরনের লেনদেন কোনো না ইত্যাদি। তাহলে আর বিস্তারিত খুলে বলা জায়েজ হবে না। আর যদি এমন সংক্ষিপ্ত এবং ইঙ্গিতপূর্ণ কথায় কাজ না হয়; বরং সবিস্তারে স্পষ্ট ভাষায় তার মন্দাচার তুলে ধরা জরুরি হয়ে পড়ে, তবে তা-ই করবে।

গ) কেউ যদি কাউকে এমন ক্রীতদাস ক্রয় করতে দেখে, যে কিনা চুরি, ব্যভিচার, মন্দ কাজ ও মদ্যপান ইত্যাদি অপকর্মের জন্য প্রসিদ্ধ ও পরিচিত। কিন্তু ক্রেতা তা জানেন না। তবে ক্রেতাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা তার জন্য ওয়াজিব।

তেমনি বর্তমানে কর্মী নিয়োগসহ যেকোনো প্রকার ব্যবসায়িক লেনদেনে পণ্যের গুণগত মান যদি কোনো সমস্যা থাকে আর ক্রেতা বা নিয়োগদাতার তা জানা না থাকে, তবে এ ব্যাপারে তাকে সতর্ক করা ওয়াজিব।

ঘ) কেউ যদি কোনো বিদ্বানকে কোনো গুনাহগার, পথভ্রষ্ট ও অন্যায়কারীর সাথে ওঠাবসা করতে দেখে। আর তার নিকট হতে জ্ঞানলাভেও ব্রত পায়, তবে তার উচিত উক্ত বিদ্বান মহোদয়কে এমন লোকের সাহচর্য গ্রহণে সতর্ক করা। এটা ওয়াজিব।

তবে এসব ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য একমাত্র উপদেশ ও অন্যকে সতর্ক করাই হওয়া চাই। এসব ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণত এই ভুল করে বসে যে,

অধিকাংশ ক্ষেত্রে বক্তা তার বক্তব্যে প্রতিহিংসার বাষ্প ছড়ায়। আর শয়তানও সাধারণত উপদেশ ও সহানুভূতির এ সকল উদ্দেশ্যে বাগড়া দিয়ে থাকে। তাই এ ধরনের স্পর্শকাতর বিষয় খুব বুঝে বুঝে করা উচিত।

(৫) প্রকাশ্য অন্যায়, অনাচার ও বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তির গীবত করা জায়েজ। যেমন প্রকাশ্যে মদ্য পান করা। মানুষের সম্পদ গ্রাস করা, অন্যায়ভাবে খাজনা বা কর আদায় করা বা মন্দকাজে নেতৃত্ব দেওয়া ইত্যাদি। মোটকথা যে সকল অপকর্ম সে প্রকাশ্য করে বেড়ায়, সেসবের উল্লেখ করে তাকে সম্বোধন বা তার আলোচনা করা জায়েজ আছে। তবে এসবের বাইরে তার কোনো গোপন দোষ থাকলেও প্রকাশ্যে সেসব আলোচনা জায়েজ নেই। যদিও তা উল্লেখ করার মতো যৌক্তিক কোনো কারণ পাওয়া যায়।

(৬) মানুষকে তার এমন অপছন্দনীয় পরিচয়ে ডাকা জায়েজ আছে যে নামে সে সর্বজনপরিচিত। যেমন : কানা, ল্যাংড়া, বধির, অন্ধ, টারা ও নাক বোঁচা ইত্যাদি। পরিচয়দানের জন্য এসব নামে ডাকা বা উল্লেখ করা জায়েজ আছে। তবে হেয় করার উদ্দেশ্যে এসব নামে ডাকা অকাট্যভাবে হারাম। যদি এ সকল বিশেষণের বাইরে তাদের চেনার অন্য কোনো উপায় থাকে তবে তা অবলম্বন করাই শ্রেয়।

ওপরে উল্লেখিত ছয় কারণে উলামায়ে কেরাম গীবতকে জায়েজ বলেছেন। ইমাম আবু হামিদ গাজালী (رحمہ اللہ) তার *ইহইয়া* গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং অন্যান্য উলামায়ে কেরামও এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।<sup>৫৯</sup>

আর এ ধরনের গীবত জায়েজ হওয়ার অনেক দলিল-প্রমাণ সহীহ ও প্রসিদ্ধ হাদীসসমূহে রয়েছে। আর এসবের অধিকাংশের ব্যাপারেই উলামায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে যে, এ ধরনের গীবত জায়েজ।

৫৯. *ইহইয়াউ উলুমুদ দীন*: ১/১৫২-১৫৩, ইমাম নববী (رحمہ اللہ) তার *রিয়াজুস সালিহীন* গ্রন্থে ২৫৬ নং বাবে এই আলোচনা করেছেন।



২৪. আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " ائْذِنُوا لَهُ، يَنْسُ أَخُو الْعَشِيرَةِ "

একবার এক ব্যক্তি রাসূল (ﷺ)-এর নিকট আসার অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, তাকে অনুমতি দাও। সে বংশের নিকৃষ্ট ভাই।<sup>৩০</sup>

এই হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী (রাঃ) দুষ্কৃতকারী ও সন্দেহজনক মানুষের গীবতকে জায়েজ বলেছেন।

২৫. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَاللَّهِ مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِهَذَا وَجْهَ اللَّهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ، وَقَالَ: "رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى، لَقَدْ أُودِيَ بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ"

একবার রাসূল (ﷺ) (মানুষের মাঝে) কিছু জিনিস বণ্টন করেন। তখন আনসারদের মধ্য হতে জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল, আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ (ﷺ) এই বণ্টনে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার ইচ্ছা করেননি। এরপর আমি রাসূল (ﷺ)-এর খিদমাতে আসলাম এবং বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলাম। (অসন্তোষে) তাঁর চেহারার রং পালটে গেল। আর তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা মুসা (রাঃ)-এর প্রতি রহম করুন। তাকে এর চেয়ে বেশি কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তবু তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন।

কোনো কোনো বর্ণনায় আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন, এ ঘটনার পর আমি বললাম, আমি তার থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করব না।<sup>৩১</sup>

গ্রন্থকার বলেন, ইমাম বুখারী (রাঃ) এই হাদীসের আলোকে বলেন, মানুষের উচিত তার বন্ধু-বান্ধবকে তার সম্পর্কে লোকে কী বলে তা অবহিত করা।

৩০. বুখারী: ৬০৫৪; মুসলিম: ২৫৯১

৩১. বুখারী: ৩৪০৫, ৪৩৩৬, ৬০৫৯; মুসলিম: ১০৬২।

২৬. আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا"

অমুক অমুক ব্যক্তি আমাদের দীন সম্পর্কে কিছু জানে বলে আমি ধারণা করি না।<sup>৬২</sup>

এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের একজন লাইস বিন সাদ বলেন, 'তারা উভয়ই মুনাফিক ছিল।'

২৭. য়ায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي لَاحِظٍ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْقُضُوا مِنْ حَوْلِهِ، وَقَالَ: "لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ" (المنافقون: ٨) قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَسَأَلَهُ فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ، فَقَالَ: كَذَبَ زَيْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوهُ شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقِي "إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ" (المنافقون: ١) قَالَ: ثُمَّ دَعَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، قَالَ: فَلَوْوَا رُءُوسَهُمْ، وَقَوْلُهُ "كَانَهُمْ خُشْبٌ مُسْنَدَةٌ" (المنافقون: ٤) وَقَالَ: كَانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ

আমরা একবার রাসূল (ﷺ)-এর সাথে (জিহাদের) সফরে বের হলাম। সে সফরে মানুষের খুব কষ্ট হলো। তখন আব্দুল্লাহ বিন উবাই বলল, তোমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে থাকা লোকদের জন্য খরচ কোরো না। যতক্ষণ না তারা তার নিকট হতে সরে পড়ে। আর সে এ কথাও বলে,

لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ

আমরা মদীনায় ফিরে গেলে অবশ্যই আমাদের সম্মানি লোকেরা সেখান হতে নীচু লোকদের বের করে দেবে।<sup>৬৩</sup>

৬২. বুখারী: ৬০৬৮

৬৩. সূরা মুনাফিকুন, ৬৩: ০৮



যায়েদ (ؓ) বলেন, এরপর আমি রাসূল (ﷺ)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলাম। তিনি তখন আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে ডেকে পাঠালেন এবং এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে কসম খেয়ে নিজের কৃতকর্ম অস্বীকার করল এবং বলল, যায়েদ রাসূল (ﷺ)-এর কাছে মিথ্যা বলেছে। তাদের এ কথায় আমি মনে খুব কষ্ট পেলাম। অবশেষে আমার কথার স্বপক্ষে মহান আল্লাহ তাআলা আয়াত নাজিল করলেন :

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ

‘আর যখন আপনার নিকট মুনাফিকরা আসে।’<sup>৬৪</sup>

তখন রাসূল (ﷺ) ইসতিগফারের (তওবার) উদ্দেশ্যে তাদের ডাকলেন। কিন্তু তারা (ঔদ্ধত্য দেখিয়ে) ঘাড় ঘুড়িয়ে বিরত থাকল। নাজিলকৃত আয়াতসমূহের মধ্যে এটিও একটি :

كَانَهُمْ خَشْبٌ مُّسْتَدَرَّةٌ

‘তারা যেন স্থির-অবিচল হেলানো কাঠ।’<sup>৬৫</sup>

যায়েদ (ؓ) বলেন, তারা (দেখতে) খুব সুন্দর ছিল (কিন্তু ভেতরটা ছিল কদর্য)।<sup>৬৬</sup>

এ ছাড়াও বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আবু সুফিয়ান (ؓ)-এর স্ত্রী হিন্দা (ؓ) নিজের স্বামী সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন,

إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ

অর্থ : নিশ্চয় আবু সুফিয়ান খুব কৃপণ লোক।<sup>৬৭</sup>

অন্যত্র ফাতিমা বিনতে কাইস (ؓ) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেন,

৬৪. সূরা মুনাফিকুন, ৬৩ : ০১

৬৫. সূরা মুনাফিকুন, ৬৩ : ০৪

৬৬. বুখারী : ৪৯০৩; মুসলিম : ২৭৭২। বুখারীর বর্ণনায় ভিন্নতা রয়েছে। গ্রন্থকার মূল কপিতে সম্পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করেননি। পাঠকের সুবিধার্থে অনুবাদকের পক্ষ হতে পূর্ণ হাদীস তুলে ধরা হয়েছে।

৬৭. বুখারী : ৫৩৫৯, ৭১৮০; মুসলিম : ১৭১৪। এক বর্ণনায় ‘مَسِيكٌ’ মিসসিক’ শব্দও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ একই, কৃপণ।

"أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُغْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ "

আবু জাহাম তার কাঁধ হতে লাঠি নামায় না (অর্থাৎ শাসন করে)। আর মুআবিয়ার বিষয় হলো, সে কপর্দকহীন; তার কোন সম্পদ নেই। ৬৮

### উস্তাদ, সঙ্গী বা অন্যদের গীবত শুনলে করণীয়

এ কথা জেনে রাখা দরকার যে, কোনো মুসলমানের গীবত কর্ণগোচর হওয়ামাত্রই শ্রোতার কর্তব্য হলো গীবতকারীকে বাধা দেওয়া এবং তাকে সতর্ক করে দেওয়া। যদি মুখের কথায় সে নিবৃত্ত না হয়, তাহলে প্রয়োজনে হাত দ্বারা তাকে প্রতিহত করবে। আর যদি হাত বা মুখ দ্বারা প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তবে উক্ত মজলিস ত্যাগ করবে।

আর যদি কোনো ব্যক্তির সামনে তার অনুসরণীয় শাইখ, উস্তাদ বা এমন কোনো সম্মানিত ব্যক্তির গীবত করা হয়, তার প্রতি যার বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে পূর্বেকার তুলনায় আরও কঠোর হস্তে তা প্রতিহত করা চাই।

২৮. আবুদ দারদা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেন,

"مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের মর্যাদাহানিকে প্রতিহত করে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার চেহারা হতে জাহান্নামের আগুনকে হটিয়ে দেবেন। ৬৯

ইমাম তিরমিযী (رحمته الله) বলেন, 'হাদীসটি হাসান।'

২৯. ইতবান ইবনে মালিক (رضي الله عنه) একটি দীর্ঘ ও প্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণনাক্রমে বলেন,

"قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَقَالُوا: أَيْنَ مَلِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: ذَلِكَ مُتَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُلْ ذَلِكَ، أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ"

৬৮. মুসলিম: ১৪৮০

৬৯. তিরমিযী: ১৯৩১



রাসূল (ﷺ) নামাজের জন্য দাঁড়ালেন, এমন সময় কয়েকজন বলল, ‘মালিক বিন দুখশুম’ কোথায়? উত্তরে জনৈক ব্যক্তি বলল ‘সে তো মুনাফিক, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসে না।’ তখন নবীজি (ﷺ) বললেন, ‘এভাবে বোলো না। তুমি কি দেখছ না যে, সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে?’<sup>১০</sup>

৩০. হাসান বসরী (رحمته الله) বলেন,

أَنَّ عَائِدَ بْنَ عَمْرٍو، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، فَقَالَ: أَيُّ بُنَيَّ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ»، فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نَحْلَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نَحْلَةٌ؟ إِنَّمَا كَانَتْ النُّحَالَةُ بَعْدَهُمْ، وَفِي غَيْرِهِمْ

আয়িজ ইবনে আমর (رحمته الله) ছিলেন রাসূল (ﷺ)-এর সাহাবীদের একজন। একবার তিনি (শাসক) উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে গিয়ে বললেন, ‘হে বৎস, আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি : ‘অত্যাচারী শাসক হচ্ছে নিকৃষ্ট রাখাল।’ অতএব তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকো।’ এ কথা শুনে (ক্রুদ্ধ হয়ে) ইবনে যিয়াদ বলল, আপনি বসুন। আপনি তো হলেন মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সাহাবীগণের মধ্যকার ভূসিগুলোর (অপদার্থ অর্থে) অন্তর্ভুক্ত।

উত্তরে আয়িজ (رحمته الله) বললেন, তাদের মধ্যেও কি কেউ ভূসি (অপদার্থ) ছিল? কখনোই নয়। বরং তাদের পরে অন্যদের মধ্য হতে ভূসির (অপদার্থ) আবির্ভাব ঘটেছে।<sup>১১</sup>

১০. বুখারী: ৪২৫; মুসলিম: ৩৩। কোনো বর্ণনায় ‘দুখশুম’ আবার কোনো বর্ণনায় ‘দুখাইশিন’ আছে।

১১. মুসলিম: ১৮৩০। ‘النُّحَالَةُ’ ‘নুখালা’ শব্দের অর্থ ভূসি, কুঁড়া, আবর্জনা ইত্যাদি। তবে আসহাবে রাসূলের শানে ‘আবর্জনা’ শব্দে অনুবাদ করা আদবের খেলাফ হবে। (অনুবাদক)

৩১. কাব বিন মালিক (رضي الله عنه) তার (তাবুকের সফরে অনুপস্থিতি ও তৎপরবর্তী অবস্থা থেকে) তওবা-সংক্রান্ত দীর্ঘ হাদীসের এক স্থানে এসে বলেন,

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ يَتَّبِعُكَ مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بِشَسَ مَا قُلْتَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

তাবুকে এক দলের সাথে বসা অবস্থায় রাসূল (ﷺ) বললেন : কাব বিন মালিক কী করল? বনু সালমা গোত্রের একজন বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ, তার ধন-সম্পদ তাকে বাধা দিয়েছে আর তার দৃষ্টি অর্জিত সম্পদে আটকে গেছে। এ কথা শুনে মুআজ বিন জাবাল (رضي الله عنه) বলে উঠলেন, 'তুমি যা বললে তা খুব খারাপ কথা (ঠিক নয়)। ইয়া রাসূলান্নাহ, আল্লাহর কসম! আমরা তাকে উত্তম লোক বলেই জানি। তখন রাসূল (ﷺ) নীরব রইলেন।<sup>৭২</sup>

ইমাম নববী (رحمته الله) বলেন, উল্লেখিত গোত্রের নাম বনু সালিমা হবে।

‘عِطْفَ’ ‘ইতফ’ শব্দের অর্থ কাছে, পাশে বা সম্পর্ক। এখানে নিজের কাছে থাকা বস্তু সম্পর্কে আত্মতুষ্টিতে ভোগা বোঝানো হয়েছে।

৩২. জাবির বিন আব্দুল্লাহ ও আবু তলহা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, তারা বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْذُلُ أَمْرًا مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُسْتَقْصُ فِيهِ مِنْ عَرْضِهِ، إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَتَهُ، وَمَا مِنْ أَمْرٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُسْتَقْصُ فِيهِ مِنْ عَرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ، إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نَصْرَتَهُ



‘যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে এমন স্থানে অপদস্থ করে যেখানে তার ইজ্জত-আব্রু হুমকির মুখে থাকে এবং মানহানি ঘটে। আল্লাহ তাআলা তাকে এমন স্থানে অপদস্থ করবেন যেখানে সে আল্লাহ তাআলার সাহায্য কামনা করবে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে এমন স্থানে সাহায্য করে যেখানে তার ইজ্জত-আব্রু হুমকির মুখে থাকে এবং মানহানি ঘটায় আশঙ্কা দেখা দেয়। আল্লাহ তাআলা তাকে এমন স্থানে সাহায্য করবেন যেখানে সে আল্লাহ তাআলার সাহায্য কামনা করবে।<sup>১০</sup>

৩৩. মুআজ বিন আনাস জুহানী (رضي الله عنه) নবী করীম (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন,  
 "مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ، أَرَاهُ قَالَ: بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ، حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ"

যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের ইজ্জত-আব্রুকে মুনাফিকের হাত হতে রক্ষা করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা একজন ফিরিশতা পাঠাবেন যে তার গোশত (শরীরকে জাহান্নামের আগুন থেকে) রক্ষা করবে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের বদনাম করার জন্য তার নামে অপবাদ দেয়। আল্লাহ তাকে জাহান্নামের সাঁকোর ওপর বন্দী করবেন। অতঃপর (শাস্তি লাভের পর) সে যা বলেছে তা থেকে বের হয়ে আসবে (মুক্তি পাবে)।<sup>১১</sup>

## মনে মনে গীবত করা

মুখের ভাষায় গীবত বা পরনিন্দা করার মতোই মনে মনে কু-ধারণা পোষণ করাও হারাম। অর্থাৎ ভাষার ব্যবহারে কারও গীবত করা যেমন হারাম, অনুরূপভাবে মনে মনে কাউকে খারাপ বলা বা খারাপ ধারণা করাও হারাম।

১০. আবু দাউদ: ৪৮৮৪; মুসনাদে আহমদ: ৪/৩০; জামে সগীর: ৫৫৬৬

১১. আবু দাউদ: ৪৮৮৩

আল্লাহ তাআলা বলেন :

‘اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ’

‘তোমরা অতিরিক্ত ধারণা করা থেকে বিরত থাকো।’<sup>১৫</sup>

৩৪. আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

“إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ”

তোমরা অনুমান থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, অনুমান বড় মিথ্যা বিষয়।<sup>১৬</sup>

এ ধরনের অর্থ-বিশিষ্ট অসংখ্য হাদীস রয়েছে। আর এখানে ধারণা বা কু-ধারণা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কারও প্রতি মনের মধ্যে কোনো ধারণা বদ্ধমূল করা এবং এ ব্যাপারে নিজ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। আর কারও কোনো বিষয়ে যদি মনের মধ্যে খটকা বা সন্দেহের উদ্বেক হয় আর এ ব্যাপারে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস বা স্থায়িত্ব না থাকে। তবে উলামায়ে কেরামের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তা মাফ। কেননা, এ ধরনের ধারণার উদ্বেক মানুষের ইচ্ছাধীন নয় এবং তা থেকে পরিত্রাণের তেমন কোনো উপায়ও নেই।

৩৫. আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

“إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمَ”

আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের অন্তরে জাগ্রত ধারণাসমূহকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, যতক্ষণ না সে তা বলে বা করে।<sup>১৭</sup>

উলামায়ে কেরাম বলেন, এই হাদীসে “অন্তরের ধারণার উদ্বেক” দ্বারা খটকা লাগা জাতীয় ধারণাকে বোঝানো হয়েছে যদি তা অন্তরে স্থায়িত্ব লাভ না করে। তবে এ ধরনের খটকা গীবত হোক বা কুফরি হোক তা মাফ। যার অন্তরে কোনোরূপ কুফরি কথার উদ্বেক হয় আর তা ধারণা পর্যন্তই সীমিত থাকে। বাস্তবায়নের কোনো ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা হয় না;

১৫. সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১২

১৬. বুখারী: ৬০৬৬; মুসলিম: ২৫৬৬

১৭. বুখারী: ৫২৬৯; মুসলিম: ১২৭



বরং তৎক্ষণাৎ তা ধ্যান-ধারণা থেকে বিদূরিত করে দেয়। তবে উক্ত ব্যক্তি কাফের হবে না। এবং তার ওপর শরয়ী কোনো বিধানও আরোপ হবে না। আর ওয়াসওয়াসা বা সন্দেহমূলক ধারণা থেকে পরিত্রাণের উপায় ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) আরজ করলেন,   
 إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاطَى أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: "وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟"   
 قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ

‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের কারও কারও মনে এমন এমন ধারণার উদ্বেগ হয় যা মুখে উচ্চারণ করা খুবই মারাত্মক বিষয়!’

রাসূল (ﷺ) বললেন, ‘সত্যিই কি তোমরা অন্তরে এমন কিছু পেয়েছ?’

সাহাবাগণ বললেন, ‘জি হ্যাঁ।’

রাসূল (ﷺ) বললেন, ‘এটাই সত্যিকারের ঈমান।’<sup>৭৮</sup>

এ ছাড়াও এ ধরনের আরও অনেক হাদীস রয়েছে যেগুলো ওয়াসওয়াসার আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। আর ওয়াসওয়াসা-জাতীয় সন্দেহমূলক ধারণা মাফ হওয়ার মূল কারণ হলো, মানুষের পক্ষে এসব থেকে নিবৃত্ত থাকা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে এ ধরনের ধারণাকে স্থায়ী রূপ দেওয়া থেকে বিরত থাকা মোটেও কষ্টকর নয়; বরং খুব সহজেই তা সম্ভব। আর এ জন্যই এ ধরনের ধারণাকে বাস্তবায়নের ইচ্ছা পোষণ বা তাকে স্থায়িত্ব প্রদান করা হারাম।

আর যখনই গীবত বা এ ধরনের কোনো গুনাহের কুমন্ত্রণা বা খটকা অন্তরে অনুভব করবে তৎক্ষণাৎ এসব ধারণা এড়িয়ে চলে তা থেকে দূরে থাকা আবশ্যিক। এবং উক্ত মন্দ ধারণার বিপক্ষে উপযুক্ত ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে তাকে সঠিক সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা জরুরি।

ইমাম আবু হামিদ গাজালী (رحمہ اللہ) তার ইহইয়া গ্রন্থে বলেন, ‘যখনই আপনার অন্তরে কোনোরূপ খারাপ ধারণা বা কুমন্ত্রণার উদ্বেক হয়, নিশ্চিত মনে রাখবেন এটা শয়তানের কাজ। যা সে আপনার অন্তরে ঢেলে দিয়েছে। তাই এ ধরনের কু-ধারণাকে উপড়ে ফেলে তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা। কেননা, শয়তানই সবচেয়ে বড় ফাসিক বা দুষ্কৃতকারী।’<sup>৭৯</sup>

আর আল্লাহ তাআলা বলেন :

‘يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ’

‘হে মুমিনগণ, যদি কোনো পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোনো সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে। যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।’<sup>৮০</sup>

সুতরাং ইবলিশ শয়তানকে সত্যায়ন করা (তার কুমন্ত্রণায় চলা) জায়েজ নেই। যদি সেখানে এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা ফিতনা-ফাসাদ তথা বিশৃঙ্খলা হওয়া বা না হওয়া উভয়ের সম্ভাবনা রাখে, তবে কু-ধারণা পোষণ জায়েজ নয়।

আর মন্দ ধারণার আলামতসমূহের একটি এই যে, যার ব্যাপারে এই ধারণার উদ্বেক হয় তার প্রতি আপনার অন্তরে ইতিপূর্বে যে ধ্যান-ধারণা ছিল, তা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া। তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া, তার উপস্থিতি অসহ্য লাগা বা তার ইজ্জত, সম্মান ও ভালোমন্দের প্রতি লক্ষ্য হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি। কেননা, শয়তান কখনো কখনো মানুষের অন্তরে সামান্য কুমন্ত্রণা ঢেলে দেয়। আর তার মনে ধারণা সৃষ্টি করে যে, এটা বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টির পরিচয়। মূলত মুমিনমাত্রই আল্লাহ

৭৯. ইহইয়াউ উলুমুদ দীন: ১/১৫০-১৫১

৮০. সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ৬



তাআলার নূরের (হিদায়াতের) দৃষ্টিতে দেখে থাকে। কিন্তু এমতাবস্থায় সে শয়তানের ধোঁকা আর অন্ধকারাচ্ছন্ন (বিভ্রান্ত) দৃষ্টিতে দেখতে থাকে।

আর যদি এমন গীবত-জাতীয় সংবাদ কোনো সৎ লোক দিয়ে থাকে। তবে তার সংবাদকে সত্য বা মিথ্যা কোনোটাই না বলা চাই, যেন কারও প্রতি মন্দ ধারণার অবকাশ না থাকে। আর যদি আপনার অন্তরে কোনো মুসলমানের প্রতি কোনোরূপ খারাপ ধারণার উদ্বেক ঘটে, তবে মনের মধ্যে তার ইজ্জত-সম্মানকে আরও বৃদ্ধি করে নিন। কেননা, শয়তান এতে মনঃক্ষুণ্ণ হবে এবং ভবিষ্যতে আপনার অন্তরে তার ব্যাপারে আর কোনো কুমন্ত্রণা ঢালবে না, যদ্বরূন আপনি তার জন্য দুআ ও নেক আমলে নিমগ্ন হয়ে যাবেন।

আর যখন আপনি কোনো মুসলমানের দোষ সম্পর্কে সন্দেহাতীতভাবে অবগত হন। তখন আপনার উচিত, তাকে একান্ত নির্জনে সদুপদেশ দেওয়া। যেন শয়তান আপনাকে তার গীবতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে ধোঁকা দিতে না পারে। আর যখন তাকে উপদেশ ও সুপরামর্শ দেবেন তখন তা এমনভাবে না দেওয়া যে, তার দোষ সম্পর্কে অবগত হওয়ায় আপনি খুব খুশি, সে আপনাকে সম্মানের চোখে দেখছে আর আপনি তাকে হেয় দৃষ্টিতে দেখছেন! বরং তাকে তার মন্দাচার থেকে প্রকৃত সংশোধনের লক্ষ্যে উপদেশ দিন। পাশাপাশি তার ব্যাপারে এমন উদ্বেগ প্রকাশ করুন যেমনটা নিজে এ ধরনের মন্দাচারে নিমজ্জিত হলে উদ্ভিগ্ন হতেন; বরং আপনার কামনায় অধিক পছন্দনীয় এটাই হওয়া উচিত যে, সে যেন আপনার পক্ষ হতে কোনোরূপ সদুপদেশ ইত্যাদি ব্যতিরেকেই সকল মন্দাচার ত্যাগ করে। এটাই ইমাম গাজালী (رحمہ اللہ)-এর অভিমত।

ইমাম নববী (رحمہ اللہ) বলেন, 'ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, যখনই কোনো মন্দ ধারণার সম্ভাবনা দেখা দেবে তখন তা পরিহার করা আবশ্যিক। আর এ ধরনের আবশ্যিকতাও তখনই প্রযোজ্য যখন এতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কল্যাণের কিছু না থাকে। আর যদি এ ধরনের

আলোচনায় শরীয়তসম্মত কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে, তবে এসব ক্ষেত্রে দোষত্রুটি-সম্পর্কিত তথ্য-তালিশ ও চিন্তা-ভাবনা করা জায়েজ আছে। যেমন সাক্ষী কিংবা হাদীস বর্ণনাকারী রাবীর দোষত্রুটি ইত্যাদি অনুসন্ধান করা জায়েজ। যা ইতিপূর্বে জায়েজ গীবতের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

### গীবতের কাফফারা ও তা থেকে তাওবা করা

এ কথা জানা থাকা দরকার যে, পাপকর্মে লিপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই অনতিবিলম্বে তাওবা করা উচিত। আর আল্লাহ তাআলার হক-সম্পর্কিত গুনাহ হতে তাওবা করার শর্ত হলো তিনটি। যথা :

১. তৎক্ষণাৎ উক্ত পাপকর্ম হতে নিবৃত্ত হওয়া।

২. কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া।

৩. ভবিষ্যতে এ ধরনের পাপের পুনরাবৃত্তি না করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা।

আর বান্দা তথা মানুষের হক-সম্পর্কিত গুনাহ হতে তাওবার ক্ষেত্রে উল্লেখিত শর্তের সাথে আরও একটি শর্ত রয়েছে। আর তা হলো, যার হক নষ্ট করেছে তাকে তার হক ফিরিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্বক তার থেকে দায়মুক্ত হওয়া।

সুতরাং গীবতকারীর জন্য ওপরোল্লেখিত চার শর্ত-সহকারে তাওবা করা ওয়াজিব। কেননা, গীবত বান্দা তথা মানুষের হক-সংশ্লিষ্ট বিষয়। অতএব যার গীবত করা হয়েছে, তার কাছ থেকেই হালাল অর্থাৎ দায়মুক্ত হওয়া চাই।

এখন কথা হলো ক্ষমা চাওয়ার পদ্ধতি কী হবে? শুধু এতটুকু বলাই কি যথেষ্ট হবে যে, আমি আপনার গীবত করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দায়মুক্ত করুন। নাকি গীবতের বিশদ বর্ণনা করাও আবশ্যিক?

এ বিষয়ে শাফেয়ী মাজহাবের আলেমগণের দুটি মত রয়েছে।



এক দল আলেমের মতে গীবতের বিশদ বিবরণ উল্লেখ করা জরুরি। বিস্তারিত বর্ণনা ব্যতীত যদি তাকে দায়মুক্ত করাও হয়। তদুপরি এই দায়মুক্তি সঠিক হবে না। যেমন অজ্ঞাত সম্পদের ক্ষেত্রে দায়মুক্ত ঘোষণা করলেও প্রকৃত অর্থে দায়মুক্ত হয় না।<sup>১১</sup>

অন্য আরেক দল আলেমের মতে গীবতের বিশদ বিবরণ দেওয়া জরুরি নয়। কেননা, এ বিষয়গুলো সহানুভূতির সাথে সম্পর্ক রাখে। তাই এ ক্ষেত্রে সম্পদের মাসআলার পথে হেঁটে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা জরুরি নয়। তবে শাফেয়ী মাজহাবের আলেমগণের নিকট প্রথমোক্ত মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য এবং এটাই শাফেয়ী মাজহাবের ফাতওয়া।

কেননা, মানুষ ক্ষেত্রবিশেষ গীবত মাফ করে দিলেও (তার সাথে বানিয়ে বলা) অন্য কিছুকে সাধারণত মাফ করে না।

আর যদি যার গীবত করা হয়েছে সে অনুপস্থিত বা মৃত হয় তবে এর থেকে মুক্তি লাভ করা কঠিন বিষয়। তবে কোনো কোনো আলেমের মতে এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির জন্য বেশি বেশি মাগফিরাতের দুআ ও অন্যান্য নেক আমল করা চাই।

যার গীবত করা হয়েছে তার উচিত গীবতকারীকে ক্ষমা করে দেওয়া। তবে এটা তার ওপর ওয়াজিব নয়। কেননা, ক্ষমা বা দায়মুক্ত করাটা তার দয়া ও নিজের অধিকার ছেড়ে দেওয়ার মতো। আর এ ব্যাপারে তার স্বাধীনতা রয়েছে। তবে তার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব যে, সে গীবতকারীকে ক্ষমা করে দায়মুক্ত করবে। যেন অপর মুসলমান ভাই গুনাহের বোঝা থেকে মুক্তি লাভ করে। আর সে এই ক্ষমার সুবাদে আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তাআলার পক্ষ হতে বিশাল পুণ্য ও নৈকট্যলাভে ধন্য হয়।

১১. তবে হানাফী মাজহাবে মাল ও গীবত উভয় ক্ষেত্রেই দায়মুক্তি লাভ হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالْكُظَّيْنِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٢﴾

আর যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর যারা মানুষকে ক্ষমা করে আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের পছন্দ করেন।<sup>৮২</sup>

আর এই ক্ষমা করার পদ্ধতি এই যে, নিজের মনকে এই বলে প্রবোধ দেবে, যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। একে মিটিয়ে দেওয়াও এখন আর সম্ভব নয়। অতএব এখন আর মুসলমান ভাইকে দায়মুক্ত করে পুণ্যলাভের সুযোগ হাতছাড়া করা সমীচীন হবে না।

কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন :

‘وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ أَعْمَارٍ’

অবশ্যই যে ধৈর্যধারণ করে ও ক্ষমা করে, নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ।<sup>৮৩</sup>

তিনি আরও বলেন :

‘خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ’

‘ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তুলুন, আর সৎ কাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞ জাহিলদের হতে দূরে থাকুন।’<sup>৮৪</sup>

এ ধরনের আরও অনেক আয়াত রয়েছে।

৩৬. আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) এরশাদ ফরমান,

“وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ”

‘আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার (মুসলমান) ভাইয়ের সাহায্যে মশগুল থাকে।’<sup>৮৫</sup>

৮২. সূরা আল-ইমরান, ৩ : ১৩৪

৮৩. সূরা শুরা, ৪২ : ৪৩

৮৪. সূরা আরাফ, ৭ : ১৯৯

৮৫. মুসলিম : ২৬৯৯; আবু দাউদ : ৪৯৪৬; তিরমিযী : ১৪২৫; ইবনে মাজাহ : ২২৫



ইমাম শাফেয়ী (رحمہ اللہ) বলেন,

مَنْ اسْتَغْضِبَ فَلَمْ يَغْضَبْ فَهُوَ حِمَارٌ، وَمَنْ اسْتَرْضِيَ فَلَمْ يَرْضَ فَهُوَ شَيْطَانٌ  
যাকে রাগানোর চেষ্টা করা হয় কিন্তু সে রাগান্বিত হয় না, সে হলো গাধা।  
আর যাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা হয় কিন্তু সে সন্তুষ্ট হয় না, সে হলো  
শয়তান।<sup>৪৬</sup>

পূর্ববর্তীগণ এ কথাটিকে কাব্যরূপ দিয়েছেন :

قِيلَ لِي قَدْ أَسَاءَ إِلَيْكَ فَلَانٌ \*\*\* وَمَقَامُ الْفَتَى عَلَى الذَّلِّ عَارُ  
قُلْتُ قَدْ جَاءَنَا وَأَخَذَتْ عُذْرًا \*\*\* دِيَةُ الذَّنْبِ عِنْدَنَا الْإِعْتِذَارُ

শুধাল আমায়, নিন্দা তোমার করিছে অমুকজন,  
নতশির হয়ে থাকিতে বাধে সকলই যুবক-মন।  
বলিনু আমি এসেছে কাছে মাথা পেতে সব দায়,  
এতেই শোধিছে রক্তপণ, মুক্ত হয়েছে তায়।<sup>৪৭</sup>

গ্রন্থকার বলেন, গীবতকারীর জন্য গীবতের গুনাহ হতে মুক্তিলাভের  
ব্যাপারে যা কিছু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা-ই সঠিক।

আর সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (رحمہ اللہ)-এর কথাও ধর্তব্য। তিনি বলেন,

لَا أَحِلُّ مَنْ ظَلَمَنِي

‘যে ব্যক্তি আমার ওপর অত্যাচার করেছে, আমি তাকে হালাল তথা ক্ষমা  
করব না।’

কিংবা মুহাম্মাদ বিন সিরীন (رحمہ اللہ)-এর বক্তব্য। তিনি বলেন,

إِنِّي لَمْ أُحَرِّمْهَا عَلَيْهِ فَأَحِلُّهَا، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْغِيْبَةَ عَلَيْهِ، وَمَا كُنْتُ لِأَحِلَّ مَا  
حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَبَدًا

‘যেটা আমি নিজে তার ওপর হারাম করিনি সেটা কেন আমি তার জন্য  
হালাল করতে যাব?’

৪৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ৯/১৪৩।

৪৭. শু'আবুল ইমান (বাইহাকী), ১০৬৯০।

অর্থাৎ গীবত তো তার ওপর হারাম করেছেন আল্লাহ তাআলা, আর যেটা আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন সেটা আমি হালাল করতে পারি না।<sup>৪৪</sup>

ইমাম নববী (رحمہ اللہ) বলেন, ‘বর্ণনাটি দুর্বল অথবা ইবনে সিরীন (رحمہ اللہ)-এর প্রতি ভুল সম্বন্ধযুক্ত বক্তব্য। কেননা, দায়মুক্তকারী কোনো হারামকে হালাল করেছেন না; বরং তিনি তার প্রমাণিত অধিকার পরিত্যাগ করেছেন। আর কুরআন ও সুন্নাহতে ক্ষমা করা মুস্তাহাব হওয়ার অনেক প্রমাণ রয়েছে। আর এসব প্রমাণাদি এ কথাও বোঝায় যে, যে ক্ষমা বা পরিত্যাগকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট, হক ও অধিকারসমূহ দাবি ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে তা মিটে যায়।

গ্রন্থকারের মতে ইবনে সিরীন (رحمہ اللہ)-এর কথার এই ব্যাখ্যাও হতে পারে যে, ‘আমি নিজের গীবতকে কখনোই বৈধ মনে করি না। অর্থাৎ গীবত করা হারাম। আমি একে হারামই বলে থাকি। আমি গীবতকে বৈধ বা হালাল মনে করি না। আর করতে পারিও না।’ আর এটাই সঠিক মত। কেননা, কেউ যদি বলে যে, যে ব্যক্তি আমার গীবত করে, তার জন্য আমি আমার সম্মানকে (গীবতের জন্য) বৈধ করে দিয়েছি। তবে গীবতকারী ব্যক্তি গীবতের দায় থেকে মুক্ত হবে না। আর সকলের জন্য তার গীবত করাও জায়েজ হবে না; বরং অন্যদের গীবত করার মতোই তার গীবত করাও সকলের জন্য হারামই হবে।

হাদীসে আছে রাসূল (ﷺ) ফরমান,

أَيُعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ أَبِي ضَمْضَمٍ؟ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعِزِّي عَلَى عِبَادِكَ

‘তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে আবু যমযমের মতো হতেও অপারগ? সে যখন ঘর হতে বের হতো তখন বলত, আমি আমার মান-সম্মান লোকদের সদকা করে দিয়েছি।’<sup>৪৫</sup>

৪৪. তাফসীর কুরতুবী, ১৬/৩৩৮, ৩৩৯। সূরা হজরাত ৪৯: ১২ এর ব্যাখ্যা।

৪৫. আবু দাউদ: ৪৪৮৭-৪৪৮৮। হাদীসটি মুরসাল যঈফ।



এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি আমার ওপর জুলুম করে আমি তার কাছে দুনিয়া বা আখিরাতে কোথাও এই জুলুমের জবাবদিহিতা তলব করব না। এই কথার দ্বারা ইতিপূর্বকার সকল হক ও অধিকারের দায় থেকে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা প্রকাশ পায়। কিন্তু পরবর্তী সময় ঘটী কোনো বিষয়ের দায় নতুন করে ক্ষমা ঘোষণা ছাড়া মুক্তির সম্ভাবনা রাখে না। ওয়া বিল্লাহিত তাওফিক।

### চোগলখুরি বা কুৎসা রটনা

ইতিপূর্বে চোগলখুরি হারাম হওয়া, এর প্রমাণাদি, এর শাস্তি এবং এর বাস্তবতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তবে তা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। এখন তা সবিস্তারে বর্ণনা করছি।

ইমাম গাজালী (رحمہ اللہ) তার ইহইয়া গ্রন্থে বলেন, ‘চোগলখুরি সাধারণত এমন কথাকে বলা হয়, একজন অন্যজনের কাছে তৃতীয় ব্যক্তি তার সম্পর্কে কী বলেছে তা বলে বেড়ায়। যেমন : কাউকে এ কথা বলা যে, অমুক আপনার ব্যাপারে এমন এমন বলে।’<sup>১০</sup>

মূলত চোগলখুরি শুধু এ ধরনের সাথে কথার বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং চোগলখুরির সংজ্ঞা হলো ‘এমন কথা প্রকাশ করা যা প্রকাশ হওয়াটা পছন্দনীয় নয়। অপছন্দের বিষয়টি চাই মূল বক্তার হোক বা যার সম্পর্কে বলা হয়েছে তার হোক কিংবা তৃতীয় কারও।’

আর এই বক্তব্য উদ্ধৃতকরণ তথা চোগলখুরি চাই মুখে বলে, লিখে, ইশারা বা ইঙ্গিতে হোক। অনুরূপভাবে যে কথা বলা হচ্ছে তার সম্পর্ক কথা বা কাজ যার সাথেই হোক। এমনভাবে বিষয়টি দূষণীয় হোক বা নির্দোষ। মোদাকথা, চোগলখুরি হলো, ‘এমন কোনো গোপন কথাকে প্রকাশ করা কিংবা এমন কোনো গোপনীয়তাকে ছিন্ন করা, যা প্রকাশ হওয়াটা নিতান্তই অপছন্দের।’

১০. ইহইয়াউ উলুমুদ দীন: ৩/১৫৬

অতএব মানুষের যেকোনো অবস্থাই দৃষ্টিগোচর হোক না কেন, মানুষের উচিত এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা। তবে কোনো মুসলমানের উপকার কিংবা কারও গুনাহ থেকে মুক্ত থাকার সম্ভাবনা থাকলে বলা যেতে পারে।

এ ছাড়া কেউ যদি কাউকে এমতাবস্থায় দেখে যে, সে তার সম্পদ লুকিয়ে রাখছে। তবে অন্যের কাছে তা বলে বেড়ানো চোগলখুরি।

ইমাম গাজালী (رحمہ اللہ)-এর মতে যার সামনেই চোগলখুরি করা হোক বা অন্যের কথা তার কানে তোলা হোক যে, ‘অমুক তোমার নামে এমন এমন বলেছে’, তখন শ্রোতার ওপর ছয়টি দায়িত্ব বর্তায়।

১. সে তার কথাকে সত্যায়ন করবে না। কেননা, চোগলখোর ব্যক্তি ফাসিক। তার কথা পরিত্যাজ্য।

২. তাকে এসব করতে নিষেধ করবে। উপদেশ দেবে এবং তার সামনে চোগলখুরির মন্দ দিক তুলে ধরবে।

৩. শুধু আল্লাহর জন্য তাকে ঘৃণা করবে। কেননা, এ ধরনের ব্যক্তি আল্লাহর নিকট ঘৃণিত ও অপছন্দনীয়। আর আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করা ওয়াজিব।

৪. যার দিকে ইঙ্গিত করে সে কথা বলছে, তার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন :

‘اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ’

‘তোমরা অতিরিক্ত ধারণা করা থেকে বিরত থাকো।’<sup>১১</sup>

৫. চোগলখোরের কথায় শ্রোতা যেন তার তথ্য তালাশে প্রলুব্ধ না হয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন :

‘وَلَا تَجَسَّسُوا’

‘তোমরা গোপনীয় বিষয়ে অনুসন্ধান নেমো না।’<sup>১২</sup>

১১. সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১২

১২. সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১২



৬. চোগলখোরকে যে বিষয়ে বাধা প্রদান করা হয়, তা যেন নিজের জন্য পছন্দনীয় না হয় যে, তার থেকে শোনা কথা শ্রোতা অন্যের কাছে বলে বেড়ায়।

বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি উমর বিন আব্দুল আজিজ (রাঃ)-এর সামনে অন্যের কোনো কথা বলল। তদুত্তরে উমর বিন আব্দুল আজিজ (রাঃ) বললেন, ‘তুমি যদি চাও তবে তোমার বিষয়টি আমরা বিবেচনা করে দেখতে পারি। তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও, তবে তুমি এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে :

‘إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا’

‘যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা যাচাই করো।’<sup>১৩</sup>

আর যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে :

‘هَذَا مَشَاءُ بَنِيهِ’

‘যে পশ্চাতে নিন্দা করে, একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়।’<sup>১৪</sup>

আর যদি তুমি চাও তবে তোমাকে মাফ করে দিতে পারি।’

লোকটি বলল, ‘আমিরুল মুমিনীন, আমি ক্ষমা চাই। ভবিষ্যতে আর এমন কিছু করব না।’<sup>১৫</sup>

জনৈক ব্যক্তি সাহিব ইবনে আব্বাদের নিকট একটি চিরকুট পাঠাল। যাতে তাকে কোনো এক ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়। আর সম্পদের পরিমাণও অনেক ছিল।

তিনি চিরকুটের অপর পিঠে লিখে পাঠালেন, ‘চোগলখুরি খুবই গর্হিত কাজ, যদিও তা সঠিক বিষয়ে হয়। মৃত ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ রহম

১৩. সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ৬

১৪. সূরা কলম, ৬৮ : ১১

১৫. ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন, ৩/১৫৬

করুন। ইয়াতিমকে আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করুন। তার সম্পদকে আল্লাহ খুব বাড়িয়ে দিন। আর অপচেষ্টায় লিপ্ত ব্যক্তির ওপর আল্লাহ অভিসম্পাত করুন।”<sup>৯৬</sup>

### ফিতনা ইত্যাদির আশঙ্কা থাকলে আমীর-উমারার নিকট বিনা প্রয়োজনে অন্যের কথা বলা নিষেধ

৩৭. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "لَا يُلْغِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا، فَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَخْرَجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ"

‘আমার সাথিগণের মধ্য হতে কেউ যেন আমার নিকট কারও ব্যাপারে কিছু না বলে। কেননা, আমি তোমাদের মাঝে (সকলের প্রতি) প্রশান্ত মনে আসতে পছন্দ করি।’<sup>৯৭</sup>

### শরীয়তসম্মত বংশমর্যাদাকে তিরস্কার করা নিষেধ

আল্লাহ তাআলা বলেন :

‘وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا’

‘যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পেছনে পোড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সবই জিজ্ঞাসিত হবে।’<sup>৯৮</sup>

৩৮. আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "اِثْنَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمَا كُفْرٌ: الطَّغْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ" ‘মানুষের মধ্যে এমন দুটি অভ্যাস রয়েছে যা কুফরির অন্তর্ভুক্ত—বংশ ভুলে তিরস্কার করা ও মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা।’<sup>৯৯</sup>

৯৬. ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন, ৩/১৫৭

৯৭. আবু দাউদ : ৪৮৬০; তিরমিযী : ৩৮৯৬। হাদীসটি ওয়ালাদ বিন হিশাম বা ইবনে আবি হিশাম ও জায়িদ বিন জায়িদার কারণে দুর্বল। তবে ইবনে হিব্বানের মতে জায়িদ বিন জায়িদা গ্রহণযোগ্য।

৯৮. সূরা বনি ইসরাঈল, ১৭ : ৩৬

৯৯. সহীহ মুসলিম : ৬৭; তিরমিযী : ১০০১; বুখারী : ৩৮৫০। বুখারীর হাদীসটি ইবনে আক্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত।



## আত্ম-অহমিকা প্রকাশ করা নিষেধ

আল্লাহ তাআলা বলেন :

‘فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى’

‘আর তোমরা আত্মপ্রশংসা কোরো না, তিনিই ভালো জানেন কে অধিক সংযমী।’<sup>১০০</sup>

৩৯. ইয়ায বিন হিমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,  
" إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرْ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ "

‘আল্লাহ তাআলা আমার নিকট এই মর্মে ওহী প্রেরণ করেছেন, তোমরা যেন বিনয় অবলম্বন করো। যাতে একে অন্যের প্রতি বাড়াবাড়ি না করে এবং একে অন্যের ওপর বড়াই না করে।’<sup>১০১</sup>

## মুসলমানের বিপদে উল্লাস প্রকাশ করা নিষেধ

৪০. ওয়াসিলা বিন আসকা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,  
" لَا تُظْهِرِ السَّמَاءَةَ لِأَخِيكَ فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ "

‘নিজের ভাইয়ের বিপদে উল্লাস প্রকাশ কোরো না। হতে পারে (এ কারণে) আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন এবং তোমাকে বিপদগ্রস্ত করে দেবেন।’<sup>১০২</sup>

তিরমিযি (رحمته الله) বলেন, ‘হাদীসটি হাসান।’

১০০. সূরা নাজম, ৫৩ : ৩২

১০১. মুসলিম : ২৮৬৫; আবু দাউদ : ১২১৪। মুসলিম শরীফে ইয়ায বিন হাম্মাদ (رضي الله عنه)-এর সনদে বর্ণিত।

১০২. তিরমিযি : ২৫০৬। ওয়াসিলা বিন আসকা (رضي الله عنه) হতে যঈফ সনদের উল্লেখ রয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন, নাসায়ী ও দারাকুতনি (رحمته الله) মতে হাদীসটির সনদে উমর বিন ইসমাঈল মিথ্যাক ও পরিত্যাজ্য হলেও গ্রন্থকার ইমাম তিরমিযির উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। সঠিক মত হলো, হাদীসটি হাসান গরীব।

## মুসলমানকে হেয় করা ও উপহাস করা হারাম

আল্লাহ তাআলা বলেন :

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا  
جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

‘সে সমস্ত লোক, যারা ভৎসনা-বিদ্রূপ করে সেসব মুসলমানদের প্রতি, যারা মন খুলে দান-ছদকা করে এবং তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই, শুধু নিজের পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া। অতঃপর তাদের প্রতি ঠাট্টা করে। আল্লাহও তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।’<sup>১০৩</sup>

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ  
نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْبِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

‘মুমিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গুনাহ। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই জালিম।’<sup>১০৪</sup>

তিনি আরও বলেন :

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

‘প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরিনিন্দাকারীর জন্য দুর্ভোগ।’<sup>১০৫</sup>

১০৩. সূরা তওবা, ৯ : ৭৯

১০৪. সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১১

১০৫. সূরা হুমাজাহ, ১০৪ : ১



এ বিষয়ে অগণিত সহীহ হাদীস রয়েছে। আর এর হারাম হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্যও রয়েছে।

৪১. আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,  
 "لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِغْ بَغْضُكُمْ  
 عَلَى يَبِغْ بَغْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ  
 وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْفِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ  
 بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَخْفِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ  
 حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ"

তোমরা পরস্পর হিংসা কোরো না, ধোঁকা দিয়ো না, বিদ্বেষ পোষণ কোরো না, শত্রুতা কোরো না, একজনের ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির ওপর অন্যজন প্রস্তাব দিয়ো না; বরং সকলে আল্লাহর বান্দা এবং ভাই ভাই হয়ে যাও। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি অন্যায় করবে না এবং অবজ্ঞাও করবে না। নিজের বুকের দিকে তিনবার ইশারা করে বলেন, 'তাকওয়া এখানে থাকে। মানুষের খারাপ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার ভাইকে অবজ্ঞা করে। এক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের রক্ত (জান), মাল ও ইজ্জত হারাম।'<sup>১০৬</sup>

ইমাম নববী (رحمته الله) বলেন, 'চিন্তাশীলদের জন্য হাদীসটি ব্যাপক উপকারী ও কল্যাণকর!'

৪২. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,  
 "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ  
 يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ،  
 الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ، وَغَمَطُ النَّاسِ"

'যার অন্তরে অণু-পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' জনৈক ব্যক্তি বলল, 'কেউ এটা পছন্দ করে যে, তার পোশাক সুন্দর হোক এবং তার জুতা জোড়াও সুন্দর হোক (এটাও কি অহংকার?)।'

<sup>১০৬</sup>. সহীহ মুসলিম: ২৫৬৪। ইবনে মাজাহ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। ইবনে মাজাহ: ৪২১৩

তিনি বললেন, 'আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকার হলো সত্য ও ন্যায়কে উপেক্ষা করা এবং মানুষকে অবজ্ঞা করা।'<sup>১০৭</sup>

এহুকার বলেন, 'بَطْرُ' দ্বারা অন্যের হক নষ্ট বা আদায় না করা বোঝানো হয়েছে। আর غَمَضُ যা অন্য বর্ণনায় غَمَضُ রয়েছে, তা দ্বারা অন্যকে হেয়প্রতিপন্ন করা বোঝায়।

## মিথ্যা সাক্ষ্যদান কঠোরভাবে হারাম ও নিষিদ্ধ

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

‘তোমরা মিথ্যা কথা থেকে বিরত থাকো।’<sup>১০৮</sup>

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

‘যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পেছনে পোড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সবই জিজ্ঞাসিত হবে।’<sup>১০৯</sup>

৪৩. আবু বাকরাহ (رضي الله عنه) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

" أَلَا أُنبئُكُمْ بِأكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ ثَلَاثًا، قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ وَ قَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكْرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ "

‘আমি কি তোমাদের সবচেয়ে মারাত্মক কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জানাব না?’ এ কথা তিনি তিনবার বললেন।

সাহাবীগণ বললেন, ‘অবশ্যই ইয়া রাসূলুল্লাহ।’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহ তাআলার সাথে শরিক করা, পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া।’ এতক্ষণ তিনি

১০৭. মুসলিম: ৯১; আবু দাউদ: ৪০৯১; তিরমিযী: ১৯৯৮; ইবনে মাজাহ: ৪১৭৩

১০৮. সূরা হুজ, ২২ : ৩০

১০৯. সূরা বনি ইসরাঈল, ১৭ : ৩৬



হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। এবার তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, 'সাবধান! এবং মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।'

এ কথাগুলো তিনি বারবার বলতে লাগলেন। আমরা (মনে মনে) বলতে লাগলাম, তিনি যদি চুপ করতেন।<sup>১১০</sup>

ইমাম নববী (رحمہ اللہ) বলেন, 'এ বিষয়ে আরও অনেক হাদীস রয়েছে। আমি এখানে যা উল্লেখ করেছি তা-ই যথেষ্ট। আর এ ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্যও রয়েছে।'

### দান করে খোঁটা দেওয়া নিষেধ

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ'

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা খোঁটা এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-হুকাকে নষ্ট কোরো না।'<sup>১১১</sup>?

মুফাস্সিরীনের মতে এর অর্থ হলো দানের সাওয়াবকে নষ্ট করা।

৪৪. আবু যর গিফারী (رحمہ اللہ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ، وَالْمَثَانُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ"

'আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণির লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)

<sup>১১০</sup>. বুখারী: ২৬৫৪; মুসলিম: ৮৭; তিরমিযী: ২৩০১

<sup>১১১</sup>. সুয়া বাকারাহ, ২: ২৬৪

এই কথাটি তিনবার বললেন। আবু যর (رضي الله عنه) বলে উঠলেন, 'তার ধ্বংস হবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আব্বাহর রাসূল, এরা কারা?' তিনি বললেন, 'যে পায়ের গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে চলে, কোনো কিছু দান করে খোঁটা দেয় এবং মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রি করে।'<sup>১১২</sup>

### অভিসম্পাত করা নিষেধ

৪৫. সাবিত বিন যাহহাক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন,

"لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ"

'মুমিনের ওপর লানত (অভিসম্পাত) করা তাকে হত্যা করার শামিল।'<sup>১১৩</sup>

৪৬. আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَانًا"

'সিদ্দীকের জন্য অভিশাপকারী হওয়া শোভা পায় না।'<sup>১১৪</sup>

৪৭. আবুদ দারদা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"لَا يَكُونُ اللَّعَانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

'অভিসম্পাতকারীগণ কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী বা সাক্ষ্যদানকারী হতে পারবে না।'<sup>১১৫</sup>

৪৮. সামুরা বিন জুনদুব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ، وَلَا بِغَضَبِهِ، وَلَا بِالنَّارِ"

'তোমরা একে অপরকে আব্বাহ তাআলার অভিশাপ, তাঁর গযব ও জাহান্নামের বদ-দুআ কোরো না।'<sup>১১৬</sup>

ইমাম তিরমিযী (رحمته الله) বলেন, 'হাদীসটি হাসান সহীহ।'

১১২. মুসলিম: ১০৬; আবু দাউদ: ৩০৮৭; তিরমিযী: ১২১১; ইবনে মাজাহ: ২২০

১১৩. বুখারী: ৬১০৫; মুসলিম: ১১০

১১৪. সহীহ মুসলিম: ২৫৯৭

১১৫. সহীহ মুসলিম: ২৫৯৮; আবু দাউদ: ৪৯০৭

১১৬. আবু দাউদ: ৪৯০৬; তিরমিযী: ১৯৭২। ইবনে আক্বাস, আবু হুরাইরা, ইবনে উমর ও ইমরান বিন হুসাইন (رضي الله عنه) হতেও এই হাদীসের বর্ণনা পাওয়া যায়।



৪৯. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ"

‘মুমিন কখনো তিরস্কারকারী, অভিশাপকারী, অশ্লীল এবং কটুক্তিকারী হতে পারে না।’<sup>১১৭</sup>

ইমাম তিরমিযী (رحمته الله) বলেন, ‘হাদীসটি হাসান সহীহ।’

৫০. আবুদ দারদা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন,

"إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتْ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاعًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لَعَنَ، فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا"

‘বান্দা যখন কোনো বস্তুকে অভিসম্পাত করে তখন তা আসমানের দিকে উঠে যায় আর আসমানের দরজা তার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন তা জমিনের দিকে নেমে আসে আর জমিনের দরজাও তার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর তা ডানে-বামে মোড় নেয়। এভাবে যখন কোনো পথ খুঁজে না পায় তখন যাকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে তার দিকে যায়। আর সে যদি এর যোগ্য না হয় তবে স্বয়ং অভিসম্পাতকারীর দিকে ফিরে আসে।’<sup>১১৮</sup>

৫১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ"

‘যে ব্যক্তি এমন কোনো বস্তুকে অভিশাপ দেয় যে তার যোগ্য নয়, তবে তা অভিসম্পাতকারীর দিকে ফিরে আসে।’<sup>১১৯</sup>

১১৭. সুন্নে তিরমিযী: ১৯৭৭

১১৮. আবু দাউদ: ৪৯০৫; উম্মে দারদা (رضي الله عنه) হতেও একটি বর্ণনা রয়েছে। জামিউস সগীর: ১৬৬৮

১১৯. আবু দাউদ: ৪৯০৫; সুন্নে তিরমিযী: ১৯৭৮

৫২. ইমরান বিন হুসাইন (ؑ) বলেন,

"يَتِمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ، فَضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ"

একবার রাসূল (ﷺ) কোনো এক সফরে চলছিলেন, এক আনসারী মহিলাও তার উটনীতে চড়ে যাচ্ছিলেন। উটনীটি অস্থিরভাবে নড়াচড়া শুরু করলে মহিলা তাকে অভিশাপ দিলো। রাসূল (ﷺ) তা শুনে ফেললেন। অতঃপর বলেন, 'এর ওপরে যা কিছু আছে নামিয়ে নাও আর একে ছেড়ে দাও। কেননা, এখন এটি অভিশপ্ত।'<sup>১২০</sup>

ইমাম নববী (رحمته) বলেন, 'ইমরান (ؑ)-এর পিতা হুসাইনের ইসলাম গ্রহণ ও মুসলমান অবস্থায় রাসূল (ﷺ)-এর সান্নিধ্যলাভ তথা সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মতানৈক্য রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত হলো তিনি সাহাবী। তাই তার নামের সাথে 'রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু' হবে।'

৫৩. আবু বারযাহ আসলামী (ؑ) বলেন,

"يَتِمَّا جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةٍ، عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ، إِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَضَايَقَ بِهِمُ الْجَبَلُ، فَقَالَتْ: حَلْ، اللَّهُمَّ اَلْعَنُهَا، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ"

এক সফরে আমাদের সাথে এক বালিকা উটনীতে সওয়ার হয়ে চলছিল, যার ওপর গোত্রের কিছু মালপত্র ছিল। হঠাৎ সে রাসূল (ﷺ)-কে আসতে দেখল আর পাহাড়ি পথটিও সংকীর্ণ ছিল। এমতাবস্থায় সে তার উটনীকে বলল, 'হাল (উটকে দ্রুত চালাতে প্রচলিত শব্দ)', হে আল্লাহ, একে অভিশপ্ত করুন। এ কথা শুনে রাসূল (ﷺ) বললেন, 'আমাদের সাথে এমন উটনী থাকবে না, যার ওপর অভিশাপ রয়েছে।'



অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (ﷺ) বলেন,

“لَا تُصَاحِبُنَا رَاحِلَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى”

‘আমাদের সাথে এমন বাহন থাকবে না, যার ওপর আল্লাহ তাআলার অভিশাপ রয়েছে।’<sup>১১১</sup>

গ্রন্থকার বলেন, ‘حَل’ ‘হাল’ শব্দ দ্বারা আরববাসী উট তাড়িয়ে থাকেন।

নাম-পরিচয় উল্লেখ না করে গুনাহগার ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করা

৫৪. আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

“لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ”

‘যে কৃত্রিম চুল সংযোজন করে এবং যে করায় উভয়ের ওপর আল্লাহর লানত।’<sup>১১২</sup>

এ ধরনের বক্তব্য আরও অনেক হাদীসে আছে। যেমন : জাবির আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন,

“لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا”

‘রাসূল (ﷺ) সুদখোরকে অভিসম্পাত করেছেন।’<sup>১১৩</sup>

আবু হুযাইফা (রাঃ) বলেন,

“لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَوِّرِينَ”

‘রাসূল (ﷺ) (প্রাণীর) চিত্র অঙ্কনকারীকে অভিসম্পাত দিয়েছেন।’<sup>১১৪</sup>

রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

“لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ”

‘যে জমিনের সীমানা পরিবর্তন করে, তার ওপর আল্লাহর লানত।’<sup>১১৫</sup>

১১১. সহীহ মুসলিম: ২৫৯৬

১১২. বুখারী: ৫৯৩৪; মুসলিম: ২১২৩, আয়িশা (রাঃ) হতে।

১১৩. মুসলিম: ১৫৯৭, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে।

১১৪. বুখারী: ৫৩৪৭।

১১৫. মুসলিম: ১৯৭৮, আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) হতে।

রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ"

‘চোরের ওপর আল্লাহর লানত, যে ডিম চুরি করে।’<sup>১২৬</sup>

রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ"

‘যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়, তার ওপর আল্লাহর লানত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে জবেহ করে, তার ওপর আল্লাহর লানত।’<sup>১২৭</sup>

রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"مَنْ أَخَذَتْ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُخْدِتًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ"

‘যে ব্যক্তি এখানে (মদীনায়) কোনো বিদআতী কাজ করবে বা কোনো বিদআতীকে আশ্রয় দেবে তার ওপর আল্লাহ, সকল ফিরিশতা এবং সমগ্র মানবজাতির অভিশাপ বর্ষিত হবে।’<sup>১২৮</sup>

রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

اللَّهُمَّ الْعَنَ لِحْيَانًا، وَرِعْلًا، وَذُكُورًا، وَعُصْبَةً عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

‘হে আল্লাহ, আপনি লিহযান, রি’ল, যাকওয়ান এবং উসাইয়াহ উপগোত্রের ওপর লানত বর্ষণ করুন। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করেছে।’<sup>১২৯</sup>

১২৬. বুখারী: ৬৭৮৩; মুসলিম: ১৬৮৭। বুখারীর বর্ণনা আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে।

১২৭. মুসলিম: ১৯৭৮

১২৮. বুখারী: ১৮৭০; মুসলিম: ১৩৬৬, মুসলিমের বর্ণনাটি আলী (رضي الله عنه) হতে।

১২৯. বুখারী: ৪০৯০; মুসলিম: ৬৭৫, মুসলিমের বর্ণনা আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে। এগুলো আরবের বনু সুলাইম গোত্রের উপগোত্র, যারা বিরে মাউনার ঘটনায় মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। (অনুবাদক)



রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا"

ইয়াহুদীদের ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক, তাদের জন্য (মৃত পশুর) চর্বি হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে।<sup>১০০</sup>

রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ"

রাসূল (ﷺ) বলেন, 'ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের ওপর আল্লাহর লানত। তারা তাদের নবীগণের (ﷺ) কবরসমূহকে সিজদাস্থল বানিয়ে নিয়েছে।'<sup>১০১</sup>

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন,

"لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ،  
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ"

রাসূল (ﷺ) নারীর সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ ও পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।'<sup>১০২</sup>

ইমাম নববী (رحمته الله) বলেন, 'হাদীসের এই বাক্যসমূহ হতে কোনো কোনোটি বুখারী, মুসলিমের উভয়টিতে আবার কোনোটি উভয়ের যেকোনো একটিতে রয়েছে। সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করতে গিয়ে সনদ উল্লেখ করিনি।'<sup>১০৩</sup>

৫৫. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: لَعَنَ  
اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ

রাসূল (ﷺ) একটি গাধা দেখতে পেলেন, যার চেহারা দাগ দেওয়া ছিল।  
তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এটাকে দাগ দিয়েছে তার ওপর আল্লাহ  
লানত বর্ষণ করুন।'<sup>১০৪</sup>

১০০. বুখারী: ৩৪৬০; মুসলিম: ১৫৮২, মুসলিমের বর্ণনা ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে।

১০১. বুখারী: ১৩৯০, মুসলিম: ৫২৯, আয়িশা (رضي الله عنها) হতে।

১০২. বুখারী: ৫৮৮৫।

১০৩. অনুবাদকের দুর্বল হাতে সনদ সংযুক্ত করা হয়েছে।

১০৪. মুসলিম: ২১১৭; আবু দাউদ: ২৫৬৪

৫৬. আব্দুল্লাহ বিন উমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত,

مَرَّ بِفَتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا، وَهُمْ يَزْمُونَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا "

একবার তিনি কুরাইশের কয়েকজন কিশোরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা একটি পাখিকে বেঁধে তাকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তির নিক্ষেপ করছিল। তা দেখে ইবনে উমর (رضي الله عنه) বললেন, 'যে এই কাজ করেছে তার ওপর আল্লাহর লানত।'

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'এমন ব্যক্তির ওপর আল্লাহর লানত, যে কোনো প্রাণীকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তার প্রতি তির নিক্ষেপ করে।'<sup>১০৫</sup>

### মুসলমানকে অভিসম্পাত করা হারাম

উম্মতের সর্বসম্মত ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোনো মুসলমানকে অভিসম্পাত করা হারাম। তবে মন্দ অভ্যাস ও অপরাধীদের অভিশাপ দেওয়া জায়েজ। যেমন : এ কথা বলা, অত্যাচারীদের ওপর আল্লাহর লানত, কাফিরদের ওপর আল্লাহর লানত, ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের ওপর আল্লাহর লানত, ফাসিকদের ওপর আল্লাহর লানত, প্রাণীর চিত্রকর্ম অঙ্কনকারীদের ওপর আল্লাহর লানত ইত্যাদি বলা জায়েজ আছে। যার বর্ণনা ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে।

এখন কথা হলো, নির্দিষ্ট কোনো দোষে দুষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্ত দোষ উল্লেখ করে লানত বা অভিসম্পাত করা কি জায়েজ? যেমন : ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান, অত্যাচারী, ব্যভিচারী, চিত্রাঙ্কনকারী, ফাসিক, চোর বা সুদখোরের ওপর লানত করা।

এ প্রশ্নের উত্তরে হাদীসের আলোকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বলা যায় যে, তা হারাম নয়।

১০৫. বুখারী: ৫৫১৫; মুসলিম: ১১৫৮



তবে ইমাম গাজালী (رحمہ اللہ) এ ধরনের অভিসম্পাত হারাম হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

তার মতে নিশ্চিতরূপে যার মৃত্যু কাফির অবস্থায় হয়েছে তার ব্যাপারে এ ধরনের অবকাশ রয়েছে। যেমন : আবু লাহাব, আবু জাহিল, ফিরআউন ও হামান ইত্যাদি।

অনিশ্চিত পরিণতির কারও ব্যাপারে অভিসম্পাত করা তার মতে জায়েজ নয়। এর পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘লানত মানুষকে আল্লাহর রহমত হতে দূরে সরিয়ে দেয়। আর আমরা নিশ্চিতরূপে এই ফাসিক বা কাফির ব্যক্তির শেষ পরিণাম সম্পর্কে অবগত নই।’

তিনি আরও বলেন, ‘আর যাদের ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) সুনির্দিষ্টভাবে অভিসম্পাত করেছেন, তবে এটা সম্ভব যে, রাসূল (ﷺ) তাদের কাফির অবস্থায় মৃত্যুর ব্যাপারে সম্যক অবগত ছিলেন।’

ইমাম গাজালী (رحمہ اللہ) আরও বলেন, ‘কোনো মানুষের জন্য বদ-দুআ করাও লানতের কাছাকাছি বিষয়। যা সচরাচর নিন্দনীয়। এমনকি জালিম ব্যক্তির জন্য বদ-দুআ করাও নিন্দনীয়। যেমন : কেউ বলল, আল্লাহ যেন তার দেহকে সুস্থ না করে, আল্লাহ যেন তাকে শান্তি না দেয় ইত্যাদি। তেমনিভাবে সকল প্রাণী বা জড় পদার্থকে অভিসম্পাত বা বদ-দুআ দেওয়াও নিন্দনীয় কাজ।’

**যে ব্যক্তি অভিসম্পাতের যোগ্য নন,  
তাকে অভিশাপ দিলে করণীয়**

আবু জাফর নাহহাস (رحمہ اللہ) উলামায়ে কেরামের এক জামাত হতে বর্ণনা করেন, কেউ যদি কারও প্রতি এমন অভিসম্পাত করে বসে, যার যোগ্য সে নয়, তবে অভিসম্পাতকারী যেন তৎক্ষণাৎ তা প্রত্যাহার করে এ কথা বলে, ‘উক্ত ব্যক্তি এই অভিসম্পাতের যোগ্য নন’।

## শিক্ষা ও সতর্কতামূলক বিভিন্ন বাক্যের ব্যবহার

সং কাজে আদেশ, অসং কাজে নিষেধ বা আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে 'তোমার অমঙ্গল হোক', 'হে দুর্বল ব্যক্তি', 'হে কানা', 'হে নিজের প্রতি অবিচারকারী' ইত্যাদি বলা জায়েজ আছে। তবে এ ধরনের বাক্য ব্যবহারেও মিথ্যার সংমিশ্রণ হতে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে। এবং তাতে যেন স্পষ্ট ভাষায়, ইশারা বা ইঙ্গিতে তার প্রতি কোনো অপবাদ বা নিন্দাজ্ঞাপন না হয়। এমনকি তা সত্য হলেও এর উল্লেখ না করা চাই; বরং এসবের উদ্দেশ্য যেন শুধু শাসানো বা আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়াই হয়। আর উদ্দিষ্ট ব্যক্তিরও যেন তা-ই মনে হয়।

৫৭. আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: ازْكَبْهَا، فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: ازْكَبْهَا، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: فِي الثَّالِثَةِ ازْكَبْهَا وَنِلَّكَ"

নবী করিম (ﷺ) এক ব্যক্তিকে কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বললেন, এর ওপর আরোহণ করো। সে বলল, এ তো কুরবানীর উট। রাসূল (ﷺ) বললেন, এর পিঠে আরোহণ করে চলো। সে বলল, এ তো কুরবানীর উট। এরপরও রাসূল (ﷺ) বললেন, এর পিঠে আরোহণ করো, তোমার সর্বনাশ হোক।<sup>১৩৬</sup>

৫৮. আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسَمًا، أَنَّهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اغْدِلْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَنِلَّكَ وَمَنْ يَغْدِلُ إِنْ لَمْ أَغْدِلْ؟

একবার রাসূল (ﷺ) আমাদের মাঝে নিজের অধিকারভুক্ত কিছু মাল বণ্টন করছিলেন। এমন সময় বনু তামীম গোত্রের যুল খুয়াইসিরা নামক ব্যক্তি

১৩৬. বুখারী: ১৬৮৯; মুসলিম: ১৩২২, আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে।



বলে উঠল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইনসাফ করুন। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, তোমার অমঙ্গল হোক, আমি ইনসাফ না করলে আর কে করবে? ১০৭

৫৯. আদি বিন হাতিম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا، فَقَدْ غَوَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَشِّرِ الْخَطِيبُ أَنْتَ، قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ"

এক ব্যক্তি রাসূল (ﷺ)-এর সামনে ভাষণ দিলো। সে বলল, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য করল সে সঠিক পথ পেল। আর যে ব্যক্তি তাদের অবাধ্যতা করল, সে পথভ্রষ্ট হলো। রাসূল (ﷺ) বললেন, 'তুমি নিকৃষ্ট বক্তা, তুমি বরং এভাবে বলো, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর অবাধ্যতা করল।' ১০৮

৬০. জাবির বিন আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبٍ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُو حَاطِبًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْدُخُلْنَّ حَاطِبُ النَّارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَبْتَ لَا يَدْخُلُهَا، فَإِنَّهُ شَهِدَ بَذْرًا وَالْحُدَيْيَّةَ

হাতিব বিন বালতাআ (رضي الله عنه)-এর একটি গোলাম রাসূল (ﷺ)-এর কাছে এসে হাতিব (رضي الله عنه)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, হাতিব নিশ্চয়ই জাহান্নামে যাবে। রাসূল (ﷺ) বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। সে কখনো জাহান্নামে যাবে না। কেননা, সে বদর এবং হুদাইবিয়ায় উপস্থিত ছিল। ১০৯

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু বকর (رضي الله عنه)-এর ঘটনা বর্ণিত আছে, তার ছেলে আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) মেহমানকে রাতের খানা পরিবেশন করতে গিয়ে

১০৭. বুখারী: ৩৬১০; মুসলিম: ১০৬৪

১০৮. মুসলিম: ৮৭০; আবু দাউদ: ৪৯৮১

১০৯. মুসলিম: ২৪৯৫; তিরমিযী: ৩৮৬৪

তার আগমন পর্যন্ত বিলম্ব করেন। এতে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে তিনি ছেলে আব্দুল্লাহকে 'يا غنثر' অর্থাৎ হে কমীনা/অসভ্য, বলে সম্বোধন করেন।<sup>১৪০</sup>

বুখারী ও মুসলিমের আরেক বর্ণনায় আছে, একবার জাবির (رضি) এক টুকরো কাপড় পরে নামাজ আদায় করলেন, অথচ তার কাছে আরও কাপড় ছিল। তা দেখে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এই কাজ করলেন?'

প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি এই কাজ করেছি, যেন তোমার মতো মূর্খ লোক আমাকে দেখতে পায়।' অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, আমি এই কাজ করেছি, যেন তোমার মতো নির্বোধ লোকেরা আমাকে দেখতে পায়।'<sup>১৪১</sup>

দরিদ্র, দুর্বল, ইয়াতিম ও ভিখারির প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করা এবং তাদের প্রতি বিনয় প্রদর্শন করে কোমল ভাষায় কথা বলা আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۖ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۖ

'সুতরাং আপনি ইয়াতিমের প্রতি কঠোর হবেন না এবং সাওয়ালকারীকে ধমক দেবেন না।'<sup>১৪২</sup>

তিনি আরও বলেন :

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۚ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

'আর আপনি তাদের বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত করে, তার সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব

১৪০. বুখারী : ৬০২; মুসলিম : ২০৫৭

১৪১. বুখারী : ৩৫২; মুসলিম : ২৬৬

১৪২. সূরা দুহা, ৯৩ : ৯-১০



বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাব বিন্দুমাত্রও তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদের বিতাড়িত করবেন। নতুবা আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।<sup>১৪০</sup>

আরও বলেন :

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে আপনি তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না।<sup>১৪১</sup>

অন্যত্র বলেন :

“وَآخِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ”

‘ঈমানদারদের জন্য স্বীয় বাহু নত করুন।’<sup>১৪২</sup>

৬১. আয়িজ বিন আমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ، أَتَى عَلَى سَلْمَانَ، وَصُهَيْبٍ، وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ، فَقَالُوا: مَا أَخَذْتَ سَيْفُ اللَّهِ مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللَّهِ مَا أَخَذَهَا، قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخٍ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ، لَئِنْ كُنْتُ أَغْضَبْتَهُمْ، لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ» فَأَتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهُ أَغْضَبْتُكُمْ؟ قَالُوا: لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَخِي

একবার আবু সুফিয়ান (رضي الله عنه) সালমান ফারসী, সুহাইব রুমী ও বিলাল হাবশী (رضي الله عنه)-এর কাছে আসলেন। সেখানে আরও কিছু লোক ছিল। তারা বললেন, আল্লাহর তরবারিগুলো সুযোগমতো আল্লাহর দুষমনের ঘাড়ে

১৪০. সূরা আনআম, ৬ : ৫২

১৪১. সূরা কাহাফ, ১৮ : ২৮

১৪২. সূরা হিজর, ১৫ : ৮৮

পড়েনি। আবু বকর (রাঃ) বললেন, তোমরা কুরাইশদের বয়োবৃদ্ধ ও সরদারকে এরূপ কথা বলছ? তিনি রাসূল (সঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে এ খবর জানালেন। তিনি বললেন, হে আবু বকর, তুমি সম্ভবত তাদের অসন্তুষ্ট করেছ। যদি তুমি তাদের অসন্তুষ্ট করে থাকো, তাহলে তুমি তোমার প্রতিপালককেই অসন্তুষ্ট করলে। আবু বকর (রাঃ) তাদের নিকট ফিরে আসলেন এবং বললেন, আমার ভাইয়েরা, আমি তোমাদের অসন্তুষ্ট করেছি। তারা বললেন, না, হে আমার ভাই, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।<sup>১৪৬</sup>

ইমাম নববী (রাঃ) বলেন, ‘مَأْخَذَهَا’ ‘মা’খাজাহা’ শব্দ দ্বারা এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর ইসলামপূর্ব ভুলের পরিমাণ এত বেশি যে, তখন পর্যন্ত তার দায়িত্বে থাকা হক পরিপূর্ণরূপে আদায় হয়নি।

### যে সকল শব্দের ব্যবহার মাকরুহ

৬২. আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) বলেছেন,

"لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبِثْتُ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ لِقِسْتُ نَفْسِي"

‘তোমাদের কেউ যেন এ কথা না বলে যে, “আমার আত্মা খবীস হয়ে গেছে”, তবে এ কথা বলতে পারে, আমার আত্মা কলুষিত হয়ে গেছে।”<sup>১৪৭</sup>

৬৩. আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) বলেছেন,

"لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ جَاشْتُ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ لِقِسْتُ نَفْسِي"

‘তোমাদের কেউ যেন এ কথা না বলে যে “আমার আত্মা খবীস (অসুস্থ) হয়ে গেছে”, তবে এ কথা বলতে পারে, আমার আত্মা কলুষিত হয়ে গেছে।”<sup>১৪৮</sup>

উলামায়ে কেরামের মতে উপর্যুক্ত হাদীসদ্বয়ে ‘لِقِسْتُ’ ‘লাকিসাত’ ও ‘جَاشْتُ’ ‘জাশাত’ শব্দ দুটি দ্বারা ‘غَشْتُ’ ‘গাছাত’ অর্থাৎ বমি বমি ভাব বা

১৪৬. মুসলিম: ২৫০৪

১৪৭. বুখারী: ৬১৭৯; মুসলিম: ২২৫০

১৪৮. আবু দাউদ: ৪৯৭৯



অসুস্থবোধ হওয়া বোঝানো হয়েছে। আর এ কারণেই তারা শরীর বা মন খারাপ বোঝানোর জন্য উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার না করে 'خَبَثٌ' জাতীয় শব্দের ব্যবহারকে মাকরুহ বলেছেন।

ইমাম আবু সুলাইমান খাত্তাবী (رحمہ اللہ) বলেন, 'لَفْسٌ' 'লাকিসাত' ও 'خَبَثٌ' 'জাশাত' শব্দ দুটির অর্থ একই। তবে রাসূল (ﷺ) 'خَبَثٌ' জাতীয় শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। শব্দটি খারাপ ও বিকৃত অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ে এই কথার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, কথাবর্তায় উপযুক্ত শব্দচয়ন ও বিকৃত ও অনুপযুক্ত শব্দ পরিহার করা অন্যতম একটি আদব বা শিষ্টাচার।<sup>১৪৯</sup>

### আঙুরকে 'কারম' বলে ডাকা নিষেধ

৬৪. আবু হুরাইরা (رضی اللہ عنہ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"يَقُولُونَ الْكَرْمَ إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ"

'লোকেরা (আঙুরকে) 'কারম' বলে। কিন্তু আসল 'কারম' হলো মুমিনের অন্তর।'<sup>১৫০</sup>

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে,

لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ

'তোমরা আঙুরকে 'কারম' বোলো না। কেননা, 'কারম' হলো মুসলমান।'

অন্য বর্ণনায় আছে,

"لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ الْكَرْمَ، فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ"

তোমাদের কেউ যেন আঙুরকে 'কারম' না বলে। নিশ্চয়ই 'কারম' হলো মুমিনের অন্তর।'<sup>১৫১</sup>

১৪৯. মাআলিমুস সুনান: ৫/২৫৮

১৫০. বুখারী: ৬১৮৩; 'কারম' শব্দের সাধারণ অর্থ হলো সম্মান।

১৫১. মুসলিম: ২২৪৬, ২২৪৭।

৬৫. ওয়াইল ইবনে হুজর (ؓ) হতে বর্ণিত আছে, নবী করিম (ﷺ) বলেছেন,

"لَا تَقُولُوا الْكِرْمَ وَلَكِنْ قُولُوا الْعِنَبُ وَالْحَبَلَةُ"

‘তোমরা (আঙুরকে) ‘কারম’ বোলো না; বরং তোমরা একে ‘ইনাব’ ও ‘হাবালাহ’ বোলো।’<sup>১৫২</sup>

উল্লেখিত হাদীস দুটির উদ্দেশ্য হলো আঙুর-জাতীয় ফলকে ‘الْكِرْمَ’ ‘কারম’ নামে ডাকতে নিষেধ করা এবং তা থেকে মানুষকে বিরত রাখা। জাহিলিয়াতের যুগে মানুষ এই কাজ করত। পরবর্তীকালে রাসূল (ﷺ)-এর যুগেও কেউ কেউ তা করায় রাসূল (ﷺ) এ ব্যাপারে নিষেধ করেন। ইমাম খাত্তাবী প্রমুখ আলেম বলেন, ‘রাসূল (ﷺ) এ আশঙ্কা করেছেন যে, এমন সুন্দর একটি নাম আঙুর থেকে তৈরি মদ পানের জন্য আহ্বান হিসাবে না ব্যবহার হয়। তাই তিনি একে অন্য নামে ডাকতে নির্দেশ দান করেন।’

**মানুষকে দোষারোপ করা, অহমিকা ও দস্ত প্রকাশ করা**

৬৬. আবু হুরাইরা (ؓ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ"

যখন কোনো ব্যক্তি বলে “লোকটি ধ্বংস হয়ে গেছে” তখন সে তাদের মধ্যে সর্বাধিক ধ্বংসে পতিত হয়।<sup>১৫৩</sup>

ইমাম নববী (ؒ) বলেন, হাদীসে উল্লেখিত ‘أَهْلَكُهُمْ’ শব্দের ‘এ’ হরফে পেশ ও যবর উভয় হরকতই হতে পারে। তবে পেশ হওয়াটাই বিখ্যাত। ইমাম আবু নুআইম ইস্পাহানীর হিলয়াতুল আওলিয়া গ্রন্থে এর সমর্থনে বর্ণনাও রয়েছে।<sup>১৫৪</sup>

১৫২. সহীহ মুসলিম: ২২৪৮, ইবনে মাসউদ (ؓ) হতে।

১৫৩. মুসলিম: ২৬২৩

১৫৪. হিলয়াতুল আওলিয়া : ৭/১৪১-১৪৩। তবে অন্য হাদীস দ্বারা এই হাদীসের মর্মার্থ বোঝানো হয়েছে। (অনুবাদক)



সুফিয়ান সাওরী (رحمہ اللہ)-এর পক্ষ হতে এর ব্যাখ্যায় ‘فَهُوَ مِنْ أَهْلِكِهِمْ’ বলা হয়েছে।

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হুমাইদী (رحمہ اللہ) ‘الجمع بين الصحيحين’ আল-জামউ বাইনাস সহীহাইন গ্রন্থে বলেন, প্রথম বর্ণনার কিছু রাবী বলেন, ‘আমরা জানি না যে, এই হরফটিতে যবর হবে না পেশ হবে।’

তবে হুমাইদী (رحمہ اللہ) বলেন, পেশ হওয়াটাই অধিক প্রসিদ্ধ। আর এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে ‘أَشَدُّ مَلَأَ’ তথা কঠিন ধ্বংসের মুখে পতনোন্মুখ ব্যক্তি।

আর এটা তখনই হবে যখন কেউ অন্যকে তুচ্ছ ও অপদস্থ করার হীন প্রয়াস চালাবে আর অন্যের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সচেষ্ট হবে। কেননা, সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত কী রহস্য লুকিয়ে রেখেছেন তা তার জানা নেই। ইমাম হুমাইদী (رحمہ اللہ) বলেন, আমাদের উলামায়ে কেরামের অভিমত এটাই।

ইমাম খাত্তাবী (رحمہ اللہ) তার মাআলিমুস-সুনান গ্রন্থে বলেন, ‘মানুষ সাধারণ মানুষের দোষচর্চা ও মন্দাচার করে আর বলে, মানুষ নষ্ট হয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে ইত্যাদি। যখন কেউ এ ধরনের কথা বলবে, তখন বজ্ঞা নিজে এর চেয়ে বেশি ধ্বংসের মুখে পড়বে অর্থাৎ তার অবস্থা আরও খারাপ হবে। কারণ, সে মানুষের দোষ অনুসন্ধান ও তার চর্চায় লিপ্ত হওয়ার মতো কঠিন গুনাহে লিপ্ত। তা ছাড়া অনেক সময় এ ধরনের কথাবার্তা মানুষের মধ্যে আত্মতুষ্টিসহ এই বোধ সৃষ্টি করে যে, সে অন্যদের চেয়ে মর্যাদাবান ও উত্তম। আর এটাই তার ধ্বংসের কারণ।’<sup>১৫৫</sup>

ইমাম আবু দাউদ (رحمہ اللہ) বর্ণনা করেন, কানাবী (رحمہ اللہ) ইমাম মালেক (رحمہ اللہ) হতে, তিনি সাহাল বিন আবু সালেহ (رحمہ اللہ) হতে, তিনি তার পিতা হতে আর তিনি আবু হুরাইরা (رحمہ اللہ) হতে উপর্যুক্ত হাদীস রেওয়ায়েত করেন।

অতঃপর ইমাম কানাবী (رحمہ اللہ) ইমাম মালেক (رحمہ اللہ)-এর মত উল্লেখ করে বলেন, ইমাম মালেক (رحمہ اللہ) বলেন, মানুষের দুরবস্থা দেখে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে এ ধরনের কথা বলা, অর্থাৎ দ্বীনের ঘাটতি দেখে যদি এমন কিছু বলে, তাহলে আমি তাতে দোষের কিছু দেখি না। আর যদি নিজের আত্মতুষ্টি ও মানুষকে ছোট করার মানসিকতা থেকে এমন কিছু বলে, তবে তা মাকরুহ, যা নিষেধ করা হয়েছে।<sup>১৫৬</sup>

ইমাম নববী (رحمہ اللہ) বলেন, ‘এই ব্যাখ্যার সনদ (সূত্র) সর্বোচ্চ মানের সহীহ। আর এর ব্যাখ্যা ও খোলাসায় যত বক্তব্য রয়েছে, তন্মধ্যে এটিই সবচেয়ে উত্তম, সংক্ষিপ্ত ও ব্যাপক অর্থবোধক। বিশেষ করে যখন তা ইমাম মালেক (رحمہ اللہ) হতে বর্ণিত।’

**ইচ্ছা প্রকাশের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে মাখলুককে শরিক না করা**

৬৬. হুযাইফা (رحمہ اللہ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ، وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ"  
তোমরা ‘আল্লাহ ও অমুক যা ইচ্ছা করে’ বোলো না; বরং ‘আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন অতঃপর অমুক যা ইচ্ছা করে’ বোলো।<sup>১৫৭</sup>

ইমাম খাত্তাবী (رحمہ اللہ) প্রমুখ উলামায়ে কেরাম বলেন, এই বর্ণনায় আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কেননা, আরবীতে ‘و’ হরফটি একত্রীকরণ ও অংশীদারত্ব বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আর ‘ثُمَّ’ শব্দটি বিন্যাস ও আগের কথাকে পরেরটির সাথে মিলানোর জন্য বা পর্যায়ক্রম বোঝানোর ব্যবহার হয়। আর এর মাধ্যমেই রাসূল (ﷺ) আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাকে মাখলুকের ইচ্ছার ওপর অগ্রগণ্য করার নির্দেশ দিয়েছেন।<sup>১৫৮</sup>

ইবরাহীম নাখাঈ (رحمہ اللہ) বলেন ‘أَعُوذُ بِاللَّهِ وَبِكَ’ অর্থাৎ ‘আমি আল্লাহ ও আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি’ জাতীয় বাক্য বলা মাকরুহ। তবে

১৫৬. আবু দাউদ: ৪৯৮৩

১৫৭. আবু দাউদ: ৪৯৮০; আহমদ: ৫/৩৮৪

১৫৮. মাতালিমুস সুনান: ৫/২৫৯



‘أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ’ অর্থাৎ ‘আমি প্রথমে আল্লাহর নিকট অতঃপর আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি’ জাতীয় বাক্য বলা জায়েজ।

উলামায়ে কেরাম বলেন, এমনভাবে ‘যদি প্রথমে আল্লাহ অতঃপর আপনি না হতেন, তবে আমি এমনটা করতাম’ বলা জায়েজ। পক্ষান্তরে ‘যদি আল্লাহ ও আপনি না হতেন’ জাতীয় কথা বলা জায়েজ নয়।

### নিয়ামত দানকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা

কারও জন্য ‘مُطْرِنًا بِنَوْءٍ كَذًا’ অর্থাৎ ‘অমুক তারকার প্রভাবে আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি’ জাতীয় কথা বলা মাকরুহ। যদি কেউ কোনো মৌসুম বা তারকাকে মূল কর্তা বলে বিশ্বাস করে এ ধরনের কথা বলে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি এই বিশ্বাস থাকে যে, মূল কর্তা তো আল্লাহ, কিন্তু উল্লেখিত তারকা বা অবস্থা বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস। তবে সে কাফের হবে না। তদুপরি জাহিলিয়াতের যুগের মতো এ ধরনের শব্দের ব্যবহার মাকরুহের সম্ভাবনা রাখে। কেননা, এ ধরনের শব্দ কুফরি করা বা না করা উভয়ের সম্ভাবনা রাখে।

আর বৃষ্টির সময় কী বলা উচিত তা মূল গ্রন্থের ৪৮০ নং হাদীসে রয়েছে। আর তা হলো :

مُطْرِنًا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের ওপর বৃষ্টিপাত হয়েছে।<sup>১৫২</sup>

### ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার শর্তযুক্ত বাক্য বলা

এমন কথা বলা হারাম যে, আমি যদি এই কাজ করে থাকি, তাহলে আমি ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান বা ইসলাম থেকে মুক্ত ইত্যাদি।

এ ধরনের কথা যদি বাস্তবিক অর্থেই ইসলাম ত্যাগের উদ্দেশ্যে বলে থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ সে কাফের হয়ে যাবে এবং তার ওপর মুরতাদ

১৫২. বুখারী: ৮৪৬; মুসলিম: ৭১

তথা ইসলামত্যাগের বিধিবিধান আরোপ হবে। আর যদি এমন কোনো ইচ্ছা না থাকে তবে কাফের হবে না। কিন্তু এ ধরনের কথা বলা হারাম এবং যে বলবে তার ওপর তওবা করা ওয়াজিব। আর তার তওবা হলো এ ধরনের গুনাহের চিন্তাকে অন্তর থেকে দূর করে দেবে, কৃতকর্মের প্রতি অনুতপ্ত হবে, ভবিষ্যতে আর কখনো এমন কিছু না করার দৃঢ় প্রত্যয় করবে, আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং কালিমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পাঠ করবে।

## কোনো মুসলমানকে 'হে কাফের' বলে

### সম্বোধন করা জঘন্য হারাম

৬৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ"

যখন কোনো ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইকে 'হে কাফির' বলে তখন তা দুজনের একজনের ওপর পতিত হয়। সে যা বলেছে তা যদি সত্য হয় তবে তো ঠিকই আছে, নতুবা কুফরি তার নিজের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে।<sup>১৬০</sup>

৬৮. আবু যর গিফারী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوُّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ"

'যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে কাফির বলে ডাকল অথবা বলল, 'হে আল্লাহর দুশমন', অথচ সে এরূপ নয়, তখন এ বাক্য তার নিজের দিকেই ফিরবে।'<sup>১৬১</sup>

'حَارَ' 'হারা' শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা, বুঝে যাওয়া।

১৬০. বুখারী: ৬১০৩; মুসলিম: ৬০; তিরমিযী: ২৬৩৭

১৬১. মুসলিম: ৬১; বুখারীতেও একই অর্থবিশিষ্ট বর্ণনা রয়েছে।



## কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে ঈমানহারা হওয়ার বদ-দুআ করা নিষেধ

কেউ যদি কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে এই বদ-দুআ করে যে, 'হে আল্লাহ, আপনি তার ঈমান ছিনিয়ে নিন।' তবে দুআকারী অবশ্যই গুনাহগার হবে। এখন কথা হলো, এ ধরনের দুআ করলে কি কেউ কাফের হয়ে যাবে?

এ ব্যাপারে শাফেয়ী মাজহাবের উলামায়ে কেরামের দুটি মত রয়েছে। কাজী হুসাইন (رحمہ اللہ) তার ফাতওয়াতে উভয় মতই লিপিবদ্ধ করেছেন। তন্মধ্যে কাফের না হওয়ার মতটি অধিকতর সঠিক। এর স্বপক্ষে আল্লাহর কালাম হতে প্রমাণও পেশ করেছেন, যাতে মুসা (عليه السلام)-এর কথাকে নকল করা হয়েছে :

رَبَّنَا اظْهِسْ عَلَيَّ اَمْوَالِيهِمْ وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا

'হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি তাদের সম্পদ ধ্বংস করে দিন। আর অন্তরকে এমন কঠোর করে দিন যেন তারা ঈমান আনয়ন না করে।'<sup>১৬২</sup>

তবে পূর্বের শরীয়তের বিধানকে আমাদের শরীয়ত হিসাবে মেনে নিলেও এই আয়াত দ্বারা উপর্যুক্ত মতের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করা তর্কসাপেক্ষ ব্যাপার।

## কুফরি বাক্য উচ্চারণে চাপ প্রয়োগ করলে কী করবে?

যদি কাফেরদের পক্ষ হতে কোনো মুসলমানকে কোনোরূপ কুফরি বাক্য উচ্চারণে বাধ্য করা হয় আর সে অন্তরে পূর্ণ ঈমান ও আস্থা রেখে শুধু জীবন বাঁচাতে এ ধরনের বাক্য উচ্চারণ করে, তবে সে কাফের হবে না। এর স্বপক্ষে অকাট্য প্রমাণস্বরূপ কুরআনের আয়াত রয়েছে। আর মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত মতও তা-ই।

১৬২. সূরা ইউনুস, ১০ : ৮৮

আল্লাহ তাআলার বাণী :

‘إِلَّا مَنْ أَكْثَرَهُ وَقَلْبُهُ مُّطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ’

অর্থাৎ, ‘সে ব্যতীত যাকে বাধ্য করা হয়েছে, আর তার অন্তর ঈমানের ব্যাপারে নিশ্চিত।’<sup>১৬৩</sup>

তবে অপারগ অবস্থায় নিজের জীবন রক্ষার্থে এ ধরনের বাক্য উত্তম কি না, তা নিয়ে শাফেয়ী মাজহাবের আলেমগণের মধ্যে পাঁচটি মত রয়েছে।

১. সঠিক মত হলো, এ ক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গের ওপর ধৈর্যধারণ করা এবং কোনোরূপ কুফরি বাক্য উচ্চারণ না করাই উত্তম। সহীহ হাদীস ও সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنه)-এর জীবনে এ ধরনের অনেক প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

২. জীবন বাঁচাতে এ ধরনের বাক্য উচ্চারণ করাটাই শ্রেয়।

৩. যদি তার জীবিত থাকায় মুসলমানদের উপকার হয়, যেমন সে শক্তি প্রয়োগ করে শত্রুকে পরাস্ত করতে পারবে অথবা শরীয়তের বিধান কায়েম করতে পারবে। তবে তার জন্য মুখে মুখে এ ধরনের বাক্য উচ্চারণ করে নেওয়াটাই উত্তম। আর যদি তার দ্বারা কোনো কল্যাণের সম্ভাবনা না থাকে, তবে জীবনের বিনিময়ে হলেও কুফরি বাক্য উচ্চারণ না করাই উত্তম।

৪. এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তি যদি আলেম বা অনুসরণীয় কেউ হন, তবে তার জন্য এমন পরিস্থিতিতে জীবন বিলিয়ে দেওয়াই উত্তম। যাতে তার মুখনিঃসৃত কুফরি বাক্য সাধারণ মানুষকে ধোঁকায় না ফেলে।

৫. এমন পরিস্থিতিতে জীবন রক্ষার্থে কুফরি বাক্য উচ্চারণ করা ওয়াজিব, যার স্বপক্ষে কুরআনের আয়াত রয়েছে।

১৬৩. সূরা নাহল, ১৬ : ১০৬



আল্লাহ পাক বলেন :

”وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ“

আর তোমরা তোমাদের জীবনকে ধ্বংসের মুখে নিপতিত কোরো না।<sup>১৬৪</sup>  
ইমাম নববী (رحمہ اللہ)-এর মতে শেযুক্ত মতটি অত্যন্ত দুর্বল।<sup>১৬৫</sup>

### কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার বিধান

যদি কোনো মুসলমান কোনো কাফেরকে ইসলাম গ্রহণে বল প্রয়োগ করে আর কাফের ব্যক্তি বাধ্য হয়ে কালিমা পাঠ করে নেয়, তবে এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয় :

১. উক্ত কাফের ব্যক্তি যদি দারুল হারব তথা শত্রুরাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে থাকে। তবে তার কালিমা তায়িবার সাক্ষ্যদান তার ইসলাম গ্রহণের যথার্থতা বলে গণ্য হবে।

২. যদি উক্ত ব্যক্তি জিম্মি তথা মুসলিম রাষ্ট্রে ‘নিরাপত্তা কর’-এর বিনিময়ে বসবাসকারী হয়ে থাকে। তবে চাপের মুখে কালিমা পাঠ করায় সে মুসলমান হবে না। কেননা, মুসলমানগণ তার সাথে এ ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ। তাই তার প্রতি এ ধরনের বলপ্রয়োগ অন্যায়।

একটি দুর্বল মত অনুযায়ী জিম্মি ব্যক্তিও মুসলমান হয়ে যাবে। কেননা, ইসলামের দাওয়াত এক শাস্ত্র সত্য।

### ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে কালিমা পাঠ করলে তার বিধান কী?

কোনো কাফের যদি কোনোরূপ বলপ্রয়োগ ছাড়াই কালিমা পাঠ করে তবে এখানে তিনটি বিষয় রয়েছে :

১. যদি সে ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে এই কালিমা পাঠ করে তবে সে মুসলমান হবে না। যেমন : কোনো কাফের বলল, আমি জায়েদকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ পাঠ করতে শুনেছি।

১৬৪. সূরা বাকারা, ২ : ১৯৫

১৬৫. নোট : তবে জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই।

২. কোনো মুসলমানের দাওয়াতে সে কালিমা পাঠ করল। এমতাবস্থায় সে মুসলমান হয়ে যাবে। চাই ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছায় কালিমা পাঠ করুক বা অনিচ্ছায়। যেমন : কোনো মুসলমান কোনো কাফেরকে বলল, তুমি কালিমা পাঠ করো। আর সে পাঠ করল।

৩. আর যদি কেউ কোনোরূপ দাওয়াত বা ঘটনা বর্ণনার উপলক্ষ ছাড়াই এমনিতেই বিনা কারণে 'কালিমা তাইয়িবা' পাঠ করে। তবে জুমহুর উলামায়ে কেরামের প্রসিদ্ধ ও বিদ্বদ্ধ মত হলো, সে মুসলমান হয়ে গিয়েছে। আর কিছু কিছু আলেমের মতে তার এই কালিমা পাঠ গল্গল্গলে হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় সে মুসলমান হবে না।

### কাউকে খলিফাতুদ্বাহ বলা

মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় দ্রুত নেতৃস্থানীয় কাউকে 'খলিফাতুদ্বাহ (আল্লাহর প্রতিনিধি)' বলা সমীচীন নয়। তবে 'খলিফা, খলিফাতুর রাসূল বা আমিরুল মুমিনীন' বলা জায়েজ আছে।

ইমাম আবু মুহাম্মাদ বগভী (رحمہ اللہ) তার শরহ-সুদ্বাহ গ্রন্থে বলেন, 'মুসলমানদের বিভিন্ন কার্য সমাধাকারী ব্যক্তিকে 'আমিরুল মুমিনীন বা খলিফা' বলতে সমস্যা নেই। তাদের প্রকৃত অবস্থা অনুকরণীয় ও ন্যায়পরায়ণ পূর্বসূরি ইমামগণের অনুরূপ না হলেও। যেহেতু তারা মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং মুসলিম জনতা তাদের কথা শুনে থাকে, তাই তাদের খলিফা বা আমিরুল মুমিনীন বলা যায়।' তিনি আরও বলেন, 'পূর্বসূরিদের অনুগামী ও স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সুবাদেও তাদের খলিফা (অনুগামী ও স্থলাভিষিক্ত হিসাবে) বলা যায়।' তিনি আরও বলেন, 'আদম (رحمہ اللہ) ও দাউদ (رحمہ اللہ) এর পরে আর কাউকে 'খলিফাতুদ্বাহ' ডাকা যাবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

'আমি ভূপৃষ্ঠে একজন প্রতিনিধি বানাতে চাই।'



আরও বলেন :

‘يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ’

‘হে দাউদ, আমি ভূপৃষ্ঠে আপনাকে প্রতিনিধি বানিয়েছি।’<sup>১৬৭</sup>

ইবনে আবি মুলাইকা (رضি) হতে বর্ণিত আছে, একবার জনৈক ব্যক্তি আবু বকর (رضি)-কে ‘খলিফাতুল্লাহ’ বলে সম্বোধন করলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, ‘আমি আল্লাহর রাসূলের খলিফা। এবং এতেই আমি সন্তুষ্ট।’

একবার উমর বিন আব্দুল আজিজ (رضি)-কে কেউ একজন ‘খলিফাতুল্লাহ’ বলে সম্বোধন করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, ‘তোমার অমঙ্গল হোক! তুমি অনেক দূর চলে গেছ (বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ)। আমার মা আমার নাম ‘উমর’ রেখেছেন। তুমি যদি আমাকে এই নামে ডাকো, আমি তা মেনে নেব। অতঃপর আমি যখন বড় হলাম। আমার উপনাম হলো ‘আবু হাফস’। তুমি যদি আমাকে এই নামে ডাকো, আমি তাও মেনে নেব। অতঃপর তোমরা তোমাদের দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করেছ আর আমাকে ‘আমিরুল মুমিনীন’ অভিধায় ভূষিত করেছ। অতএব তুমি যদি আমাকে এই নামে ডাকো, তবে তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

শাফেয়ী মাজহাবের প্রখ্যাত ফিকাহবিদ, বিশিষ্ট কাজী, ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদী বসরী (رضি) তার আল আহকামুস সুলতানিয়াহতে বলেন, ‘ইমামকে ‘খলিফা’ উপাধি দেওয়া উচিত। কেননা, সে উম্মতের মধ্যে রাসূল (ﷺ)-এর প্রতিনিধিত্ব করেন। সুতরাং খলিফা বা খলিফাতুর রাসূল বলা জায়েজ।’<sup>১৬৮</sup>

কাউকে ‘খলিফাতুল্লাহ’ বলা জায়েজ আছে কি না তা নিয়ে উলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে। কতিপয় আলেম একে জায়েজ বলেছেন। তাদের মতে মুসলমান শাসক যেহেতু সৃষ্টির মাঝে তার বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করেন তাই তাকে ‘খলিফাতুল্লাহ’ বলা জায়েজ।

১৬৭. সূরা ছোয়াদ, ৩৮ : ২৬

১৬৮. আল আহকামুস সুলতানিয়াহ : ১৫

কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন :

‘هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ’

‘তিনি আল্লাহ, যিনি ভূপৃষ্ঠে তোমাদের প্রতিনিধি বানিয়েছেন।’<sup>১৬৯</sup>

পক্ষান্তরে জুমহুর উলামায়ে কেরামের মতে ‘খলিফাতুল্লাহ’ বলা নাজায়েজ। আর এ মতের প্রবক্তাগণ শাসক সম্প্রদায়ের নানা অনাচারের প্রতি লক্ষ রেখে এই মত দিয়েছেন। মাওয়ারদী (رحمہ) এই মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম নববী (رحمہ) বলেন, সর্বপ্রথম ‘আমিরুল মুমিনীন’ উপাধি দেওয়া হয় উমর ইবনুল খাতাব (رضی) -কে। উলামায়ে কেরামের মধ্যে এ নিয়ে কোনো মতভেদ নেই। আর কতিপয় জ্ঞানপাপী ‘মুসাইলামাতুল কাযযাবের’ ব্যাপারে সর্বপ্রথম এই উপাধি ব্যবহারের ধারণা পোষণ করে থাকে। যা সুস্পষ্ট ভুল, নিদারুণ অজ্ঞতা এবং উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত ইজমার বিপরীত।

উলামায়ে কেরাম তাদের গ্রন্থাবলিতে স্পষ্ট ভাষায় এই ঐক্য ও ইজমার উল্লেখ করেছেন যে, ‘আমিরুল মুমিনীন’ উপাধি সর্বপ্রথম ‘উমর ইবনুল খাতাব’ (رضی) -কেই দেওয়া হয়েছে।

হাফেজ আবু উমর বিন আব্দুল বার (رحمہ) তার আল-ইসতিআব গ্রন্থে সাহাবায়ে কেরামের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, ‘উমর ইবনুল খাতাব’ (رضی) -কেই সর্বপ্রথম ‘আমিরুল মুমিনীন’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এর কারণ হিসাবে তিনি বলেন, ‘আবু বকর’ (رضی) -এর উপাধি ছিল ‘খলিফাতুর রাসূল’।<sup>১৭০</sup>

**শাসককে এমন নামে ডাকা, যা আল্লাহর শানে প্রযোজ্য**

কোনো রাজা-বাদশাহকে ‘শাহেনশাহ’ নামে ডাকা হারাম। কেননা, এর অর্থ হলো ‘মালিকুল মুলক’ তথা সকল বাদশাহর বাদশাহ। এ ধরনের বিশেষণ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য ব্যবহার করা যায় না।

১৬৯. সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩৯

১৭০. আল ইসতিআব হাশিয়াতুল ইসাবাহ : ২/৪৬৬



৬৯. আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْمَلَائِكَةِ"

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম হলো কাউকে 'মালিকুল মুলক' তথা 'রাজাধিরাজ' নামে ডাকা।<sup>১১</sup>

সুফিয়ান বিন উআইনাহ (رضي الله عنه) বলেন, 'মালিকুল মুলক' আর 'শাহেনশাহ' একই ধরনের নাম।

### সায়্যিদ শব্দের ব্যবহার

'সায়্যিদ' শব্দটি সাধারণত গোত্রের শীর্ষস্থানীয়, ক্ষমতাবান, নেতৃস্থানীয়, সম্মানিত, ক্রোধ সংবরণকারী, ধৈর্যশীল, দয়ালু, মালিক এবং কখনো কখনো স্বামীর ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়। আর সম্মানিত ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে অসংখ্য হাদীসেও 'সায়্যিদ' শব্দের ব্যবহার রয়েছে।

৭০. আবু বাকরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: "إِنَّ أَيْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ"

রাসূল (ﷺ) একবার সায়্যিদুনা হাসান (رضي الله عنه)-কে নিয়ে মিন্বরে উঠলেন এবং বললেন, 'আমার এই সন্তান (পৌত্র) সায়্যিদ তথা নেতা। আল্লাহ তাআলা তাঁর মাধ্যমে বিবদমান দুই দল মুসলমানের মধ্যে সমঝোতা করিয়ে দেবেন।'<sup>১২</sup>

৭১. আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) বলেন, বনু কুরাইযার অবরোধ শেষে যখন সাদ বিন মুআজ (رضي الله عنه) (গাধার পিঠে চড়ে) আসলেন, তখন রাসূল (ﷺ) আনসারগণকে লক্ষ্য করে বললেন,

১১. বুখারী: ৬২০৫; মুসলিম: ২১৪৩

১২. বুখারী: ২৭০৪, ৭১০৯।

"قَوْمُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُمْ" أَوْ "خَيْرِكُمْ"

‘তোমাদের নেতা বা সর্বোত্তম ব্যক্তির জন্য দাঁড়িয়ে যাও।’ কোনো কোনো বর্ণনায় শুধু ‘সায়্যিদ’ তথা নেতা শব্দ ব্যবহার হয়েছে।<sup>১০</sup>

৭২. আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত,

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقُنُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، قَالَ سَعْدٌ: بَلَى، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْمَعُوا إِلَىٰ مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ

সাদ বিন উবাদা (رضي الله عنه) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যে ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে অন্য কোনো লোক পায় (অপকর্মে লিপ্ত), সে কি তাকে হত্যা করবে? (রাসূল (ﷺ) না করেন এবং সাদ (رضي الله عنه) কসম খেয়ে হ্যাঁ বলেন। এর জবাবে) রাসূল (ﷺ) বললেন, তোমাদের সরদারের প্রতি লক্ষ্য করো ( সে কী বলে শোনো)।<sup>১১</sup>

আর ‘সায়্যিদ’ শব্দের ব্যবহার নিষেধের ক্ষেত্র-সম্পর্কিত হাদীসও রয়েছে।

৭৩. বুরাইদা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"لَا تَقُولُوا لِلْمُتَافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ"

তোমরা কোনো মুনাফিককে সায়্যিদ বোলো না। কেননা, সে যদি সায়্যিদ হয়, তবে তোমরা তোমাদের পরাক্রমশালী মহান প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করলে।<sup>১২</sup>

ইমাম নববী (رحمته الله) বলেন, ‘সায়্যিদ’ শব্দের ব্যবহারের পক্ষে ও বিপক্ষের হাদীসসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উপায় হলো, উত্তম চরিত্র, জ্ঞান কিংবা অন্য কোনো যোগ্যতার ভিত্তিতে কাউকে ‘ইয়া সায়্যিদি’ বলে সম্বোধন

১৭৩. বুখারী : ৪১২১; মুসলিম : ১৭৬৮ (উল্লেখ্য, সাদ (رضي الله عنه) অসুস্থ ছিলেন এবং তার সাহায্যে এগিয়ে যেতে দাঁড়াতে বলা হয়েছে।-অনুবাদক)

১৭৪. সহীহ মুসলিম : ১৪৯৮; আবু দাউদ : ৪৫৩২; ইবনে মাজাহ : ২৬০৫

১৭৫. সুনানে আবু দাউদ : ৪৯৭৭



করা বা অমুক সায্যিদ বলে ডাকতে কোনো সমস্যা নেই। তবে উল্লেখিত ব্যক্তি যদি ফাসিক বা দ্বীনের ব্যাপারে অভিযুক্ত হয় তবে তাকে ‘সায়্যিদ’ ডাকা মাকরুহ। ইমাম আবু সুলাইমান আল খাত্তাবী (رحمہ اللہ) তার *মাতালিমুস সুনান* গ্রন্থে এরূপ সামঞ্জস্যই ব্যক্ত করেছেন।

### মালিক ও কর্মচারীর পরস্পর সম্বোধনের আদব

কর্মচারীর জন্য নিজের মালিককে ‘رَبِّي’ (রব্বি) তথা ‘প্রভু’ বলে সম্বোধন করা মাকরুহ। তবে ‘সায়্যিদ’ বা চাইলে ‘مَوْلَايَ’ (মাওলা-য়া) অর্থাৎ আমার মালিক বা অভিভাবক বলে ডাকতে পারবে।

তেমনিভাবে মালিকের জন্য নিজ ক্রীতদাস-দাসী বা কর্মচারীকে ‘عَبْدِي’ (আবদী) আমার বান্দা ও ‘أَمَّتِي’ (আমাতী) আমার বান্দি বলে ডাকা মাকরুহ। তবে ‘فَتَايَ’ (ফাতা-য়া) আমার জাওয়ান ও ‘فَتَاتِي’ (ফাতা-তী) আমার যুবতী (আমার ছেলে বা মেয়ে) বা ‘يَا غُلَامِي’ (ইয়া গুলামী) ‘হে আমার গোলাম’ বলে ডাকতে পারবে।

৭৩. আবু হুরাইরা (رحمہ اللہ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعَمَ رَبِّكَ وَصْنِي رَبِّكَ، اسْقَ رَبِّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي مَوْلَايَ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي أَمَّتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي

‘তোমাদের কেউ যেন (নিজের অধীনস্থকে) এ কথা না বলে, তোমার রবকে খানা খাওয়াও, তোমার রবকে অজু করাও, তোমার রবকে পান করাও; বরং সে যেন আমার সায্যিদ (নেতা) এবং আমার মাওলা (অভিভাবক) বলে। তোমাদের কেউ যেন আমার বান্দা, আমার বান্দি না বলে; বরং আমার যুবক, আমার যুবতী ও আমার গোলাম বলে।’<sup>১৭৬</sup>

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে :

وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ رَبِّي، وَلْيَقُلْ سَيِّدِي مَوْلَايَ

তোমাদের কেউ যেন কাউকে আমার রব না বলে; বরং সে যেন আমার ‘সায়্যিদ’ ও আমার ‘মাওলা’ বলে।

আরেক বর্ণনায় আছে :

لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمْتِي، فَكُلُّكُمْ عَبِيدٌ، وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ: رَبِّي، وَلَيَقُلْ:  
سَيِّدِي

তোমাদের কেউ যেন আমার বান্দা ও আমার বান্দি না বলে। কারণ, তোমরা প্রত্যেকেই বান্দা। আর গোলাম যেন মনিবকে ‘আমার রব’ না বলে; বরং সে যেন ‘আমার সায়্যিদ’ বলে।

আরেক বর্ণনায় আছে :

لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمْتِي كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ، وَلَكِنْ لَيَقُلْ غُلَامِي وَجَارِيَّتِي وَفَتَاتِي

তোমাদের কেউ যেন আমার দাস আমার দাসী না বলে। তোমরা প্রত্যেকেই আল্লাহর দাস এবং তোমাদের সকল স্ত্রীলোকই আল্লাহর দাসী; বরং সে যেন আমার চাকর, আমার চাকরানি, আমার যুবক এবং আমার যুবতী বলে।<sup>১৭৭</sup>

ইমাম নববী (رحمته الله) বলেন, ‘আলিফ ও লাম’ বর্ণযোগে ‘الرَّبُّ’ ‘আর-রব’ শব্দটি শুধু আল্লাহর জন্যই ব্যবহার করা চাই। তবে ‘إِصْنَاءٌ’ অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বস্তুকে অন্য ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি সম্পর্কযুক্ত করার ক্ষেত্রে ‘রব’ শব্দের ব্যবহার করা যেতে পারে। আর তখন তা ‘মালিক’ অর্থে ব্যবহার হবে। যেমন : ‘رَبُّ الْمَالِ’ ‘সম্পদের মালিক’ ও ‘رَبُّ الدَّارِ’ ‘ঘরের মালিক’ ইত্যাদি।

এ ধরনের উদাহরণ হাদীস ও আসারেও রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের এক সহীহ বর্ণনায় হারানো উট সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেন,

" دَعَهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا "

‘একে ছেড়ে দাও, যাতে তার মালিক তাকে খুঁজে পায়।’<sup>১৭৮</sup>

১৭৭. মুসলিম: ২২৪৯

১৭৮. বুখারী: ৯১; মুসলিম: ১৭২২



সহীহাইনের আরেক বর্ণনায় রাসূল (ﷺ) বলেন,  
 "حَتَّى يُهِمَّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ"

‘কিয়ামাতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হলো, সম্পদ এত বেড়ে যাবে যে,) এমনকি সম্পদের মালিক তার সদকা কে গ্রহণ করবে তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে যাবে।’<sup>১৭৯</sup>

সহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় উমর (رضي الله عنه) বলেন,  
 رَبُّ الصَّرِيمَةِ، وَرَبُّ الْغَنِيمَةِ

‘অল্প উট ও অল্প ছাগলের মালিক (চারণভূমিতে প্রবেশ করতে পারবে)।’<sup>১৮০</sup>  
 এ ধরনের উদাহরণ আরও অনেক প্রসিদ্ধ হাদীসে রয়েছে।

তেমনিভাবে শরীয়তের বিধান প্রয়োগকারীগণ কর্তৃক এ শব্দের ব্যবহার সুপ্রসিদ্ধ। তবে উলামায়ে কেরামের মতে দাস বা কর্মচারীর জন্য তার মনিবকে ‘رَبُّ’ তথা ‘আমার প্রভু’ বলে সম্বোধন করা মাকরুহ। কেননা, এই শব্দে প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সাথে শাদ্বিক অংশীদারত্ব দেখা দেয়। আর উমর (رضي الله عنه) যে হাদীসে ‘رَبُّ الصَّرِيمَةِ’ ‘অল্প উটের মালিক বলেছেন’ এর কারণ হলো জিন ও ইনসান ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী এ ধরনের শব্দের ব্যবহারিক বিধানের আওতাভুক্ত নয়। জ্ঞান ও যোগ্যতার অভাবে এখানে ছাগলও ‘ঘর বা মাল’ ইত্যাদির মতো। আর ‘ঘর বা মালের মালিক’ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ‘রব’ শব্দের ব্যবহার নিঃসন্দেহে জায়েজ।

### একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

ইউসুফ (رضي الله عنه) জেলে বন্দী অবস্থায় স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া এক বন্দীকে বলেন :

‘أَذْكُرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ’

‘তোমার মালিকের নিকট আমার কথা বোলো।’<sup>১৮১</sup>

১৭৯. বুখারী: ১৪১২; মুসলিম: ১০১২

১৮০. বুখারী: ৩০৫৯

১৮১. সূরা ইউসুফ, ১২: ৪২

এখানে ইউসুফ (ؑ) মিসরের শাসককে 'রব' শব্দে উল্লেখ করেছেন। এর দুটি উত্তর হতে পারে।

১. ইউসুফ (ؑ) যাকে উদ্দেশ্য করে কথাটি বলেছেন সে মিসরের শাসককে 'রব্ব মিসর' বলে জানত। তাই ইউসুফ (ؑ) এই শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এমনটা জায়েজ আছে। যেমন, মুসা (ؑ) সামেরিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন :

‘وَأَنْظِرْ إِلَىٰ إِلَهِكَ’

‘আর তুমি তোমার উপাস্যের প্রতি লক্ষ করো।’<sup>১৮২</sup>

অর্থাৎ তুমি যাকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেছ।

২. ইউসুফ (ؑ)-এর শরীয়ত পূর্ববর্তী শরীয়ত। আর মূলনীতি অনুযায়ী পূর্ববর্তী শরীয়তের কোনো বিধান আমাদের শরয়ী বিধানের বিপরীত হলে তা আমাদের বিধান হিসাবে গণ্য হবে না। আর এ ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই। তবে পূর্ববর্তী শরীয়তের যেসব বিধান আমাদের শরয়ী বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, সেসব বিধান আমাদের বিধান বলে গণ্য হবে কি না তা নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

‘مَوْلَايَ’ ‘মাওলা-য়া’ অর্থাৎ আমার মনিব বলা যাবে কি?

ইমাম আবু জাফর নাহহাস (ؑ) তার সনাআতুল কুত্তাব গ্রন্থে বলেন, ‘আমার জানামতে এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই যে, কাউকে ‘مَوْلَايَ’ ‘আমার মনিব’ বলে সম্বোধন করা অনুচিত।’

ইমাম নববী (ؑ) বলেন, ইতিপূর্বে বর্ণিত ৭৩ নং হাদীস দ্বারা সাধারণভাবে কাউকে ‘مَوْلَايَ’ ‘আমার মনিব’ বলা জায়েজ প্রমাণিত হয়েছে।

নাহহাস (ؑ)-এর বক্তব্য ও হাদীসের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা, তিনি যে শব্দের ব্যবহারে আপত্তি জ্ঞাপন করেছেন তা ‘مَوْلَايَ’



‘মাওলা’ নয়; বরং ‘المَوْلَى’ ‘আল মাওলা’। যার শুরুতে ‘আলিফ ও লাম’ যুক্ত হয়েছে। এমতাবস্থায় শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় ‘প্রভু’। নাহহাস (ﷺ) ‘سَيِّد’ সাযিদ শব্দের ব্যবহারেও একই মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, পাপাচারমুক্ত ব্যক্তির জন্য ‘সাযিদ’ শব্দের ব্যবহার জায়েজ। তবে ‘السيد’ ‘আস-সাযিদু’ শব্দটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য ব্যবহার করা জায়েজ নয়।

তবে আমার মতে ইতিপূর্বে (হাদীসের ব্যাখ্যায়) বর্ণিত শর্তানুযায়ী শব্দ দুটি উভয়রূপেই ব্যবহার করা জায়েজ আছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞানী।

### বাতাসকে গালমন্দ করা নিষেধ

মূলগ্রন্থে ‘প্রবল বাতাসের সময় করণীয়’ শিরোনামে ৪৬৮ নং হাদীসে বাতাসকে গালমন্দ করতে নিষেধ করার পাশাপাশি এমন পরিস্থিতি করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

উবাই বিন কাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,  
 " لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أَمْرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أَمْرَتْ بِهِ "

‘তোমরা বাতাসকে গালমন্দ কোরো না। তোমরা যদি মন্দ কিছু দেখো, তাহলে এই দুআ পড়ো :

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أَمْرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أَمْرَتْ بِهِ

‘হে আল্লাহ, আমরা আপনার নিকট এই বাতাস এবং তার মধ্যে যা আছে আর তাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তার কল্যাণটুকু কামনা করছি। আর আপনার নিকট এই বাতাস এবং তার মধ্যে যা আছে আর তাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তার অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’<sup>১৮০</sup>

উল্লেখিত শিরোনামে আরও কিছু হাদীস রয়েছে।

১৮০. তিরমিযী: ২২৫২; ইবনে মাজাহ: ৩৭২৭, আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে।

## জ্বর ইত্যাদি রোগকে গালমন্দ করা নিষেধ

৭৪. জাবির বিন আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ: مَا لَكَ؟ يَا أُمُّ السَّائِبِ أَوْ يَا أُمِّ الْمُسَيَّبِ تُرْفَزِفِينَ؟ قَالَتْ: الْحُمَّى، لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا، فَقَالَ: لَا تَسْبِي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، كَمَا يُذْهِبُ الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ"

রাসূল (ﷺ) একবার উম্মে সাযিব বা উম্মে মুসায়িব (رضي الله عنه)-এর নিকট গেলেন। আর তাঁর অবস্থা দেখে বললেন, ‘হে উম্মে সাযিব বা উম্মে মুসায়িব, কী হয়েছে তোমার? তুমি থরথর করে কাঁপছ কেন?’ তিনি বললেন, ‘জ্বর, আল্লাহ এতে বরকত না দিন (অমঙ্গল করুন)।’ এ কথা শুনে রাসূল (ﷺ) বললেন, ‘জ্বরকে গালি দিয়ো না। কেননা, হাপর যেমন লোহার ময়লা দূর করে, জ্বরও তেমনি আদমসন্তানের গুনাহসমূহ দূর করে দেয়।’<sup>১৮৪</sup>

ইমাম নববী (رحمته الله) বলেন, ‘تُرْفَزِفِينَ’ ‘তুয়াফযিফিনা’ অর্থ দ্রুত চলা, গর্জন করা, নড়াচড়া করা (থরথর করে কাঁপা)।

কোনো কোনো বর্ণনাকারী ‘تُرْفَزِفِينَ’ ‘তুয়াফযিফিনা’ না বলে ‘تُرْفَرِفِينَ’ ‘তুরফরফিনা’ লিখেছেন। তখন অর্থ হবে ‘পতপত করে ওড়া, ডানা ঝাপটানো’। কেউ কেউ আবার ‘تُرْقَرِفِينَ’ ‘তুরকরকিনা’ও বলেছেন। এর অর্থ হলো অশ্রুসজল হওয়া, পানিমিশ্রিত হওয়া।

ইমাম নববী ও ইবনুল আছীর (رحمته الله)-সহ অধিকাংশই প্রথম মত ব্যক্ত করেছেন। আর এটাই প্রসিদ্ধ।

তবে মাদ্রালিউন গ্রন্থের রচয়িতাসহ কেউ কেউ প্রথমটির পাশাপাশি দ্বিতীয় ও তৃতীয় মতেরও উল্লেখ করেছেন।



## মোরগকে গালি দেওয়া নিষেধ

৭৫. যায়িদ বিন খালিদ আল জুহানী (رضي الله عنه) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,  
“لَا تَسُبُّوا الدِّيَكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ”

‘তোমরা মোরগকে গালি দিয়ো না। কেননা, সে নামাজের জন্য জাগিয়ে দেয়।’<sup>১৮৫</sup>

## জাহিলী যুগের বাক্যে শোক প্রকাশ করা নিষেধ

৭৬. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,  
“لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ”

‘যে ব্যক্তি (শোক প্রকাশার্থে) চেহারায় আঘাত করে, বুক চাপড়ায় আর জাহিলী যুগের শোক প্রকাশসূচক বাক্য আওড়ায়, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।’<sup>১৮৬</sup>

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় ‘وَشَقَّ’ এর স্থলে ‘أَوْ دَعَا’ রয়েছে। তখন অনুবাদে ‘এবং’ না হয়ে ‘অথবা’ হবে। অর্থাৎ উল্লেখিত তিনটির যেকোনো একটি করলেই হাদীসে উল্লেখিত বিধান প্রযোজ্য হবে।

## মুহাররম মাসকে সফর নামে ডাকা

মুহাররম মাসকে সফর নামে ডাকা মাকরুহ। কেননা, এটা জাহিলী যুগের প্রথা।

অমুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর জন্য মাগফিরাত কামনা করা যে ব্যক্তি কাফের অবস্থায় মারা গিয়েছে, তার জন্য মাগফিরাত কামনা করা বা এ-জাতীয় কোনো দুআ করা হারাম। যেমন : তার আত্মা শান্তি লাভ করুক, যেখানেই থাকুক ভালো থাকুক বা Rest in peace ইত্যাদি বলা।

১৮৫. সুনানে আবু দাউদ: ৫১০১; আহমদ: ৫/১৯২

১৮৬. সহীহ বুখারী: ১২৯৭, ১২৯৮; সহীহ মুসলিম: ১০৩।

আল্লাহ তাআলার ইরশাদ :

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

‘নবী ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা করে, যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়—এ কথা স্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামী।’<sup>১৮৭</sup>

এ বিষয়ে অনেক হাদীস রয়েছে। আর এ ব্যাপারে সকল মুসলমান একমত।

### মুসলমানকে গালি দেওয়া

শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতিরেকে কোনো মুসলমানকে গালি দেওয়া হারাম।

৭৭. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,  
"سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ"

‘মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসিকী তথা পাপ।’<sup>১৮৮</sup>

৭৮. আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,  
"الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي مِنْهُمَا، مَا لَمْ يَتَّخِذِ الْمَظْلُومُ"

‘পরস্পর গালিগালাজকারী যা বলে তা (গুনাহ) ওই ব্যক্তির ওপর বর্তায়, যে তা শুরু করেছে। যতক্ষণ না মজলুম ব্যক্তি তা ফিরিয়ে দেয়।’<sup>১৮৯</sup>

তিরমিযী (رحمته الله) বলেন, ‘হাদীসটি হাসান সহীহ।’

### কাউকে মন্দ নামে ডাকা মাকরুহ

ঝগড়া-বিবাদের সময় প্রতিপক্ষকে সম্বোধন করার জন্য সমাজে কিছু মন্দ শব্দের প্রচলন রয়েছে। যেমন : ওহে গাধা, হে ছাগল, হে কুকুর ইত্যাদি। এ ধরনের কাজ দু-কারণে ঘৃণ্য।

১৮৭. সূরা তাওবা, ৯ : ১১৩

১৮৮. সহীহ বুখারী : ৬০৪৪; সহীহ মুসলিম : ৬৪; তিরমিযী : ২৬৩৫; ইবনে মাজাহ : ৩৯৩৯

১৮৯. সহীহ মুসলিম : ২৫৮৭; তিরমিযী ১৯৮১



১. এটা সর্বৈব মিথ্যা।

২. এ দ্বারা অন্যকে কষ্ট দেওয়া হয়।

তবে এর বিপরীতে ‘হে জালেম’ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে বিবাদ এড়াতে এ কথা বলা যায় যে, ‘জালেম’-জাতীয় শব্দের মধ্যে কিছুটা হলেও সত্যের অবকাশ রয়েছে। কেননা, খুব কম মানুষই আছে যারা নিজের ও অন্যের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করেনি।

**‘আমার সাথে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাখলুক ছিল না’**

**এ-জাতীয় কথা বলা**

ইমাম নাহহাস (رحمہ اللہ) বলেন, একদল আলেমের মতে এমন কথা বলা মাকরুহ যে, ‘আমার সাথে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাখলুক ছিল না’।

ইমাম নববী (رحمہ اللہ) বলেন, ‘এ ধরনের কথা মাকরুহ হওয়ার কারণ হলো শব্দের মারপ্যাঁচ!’ উল্লেখিত কথায় ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো মাখলুক নেই’ বলার দ্বারা আল্লাহ তাআলাকেও মাখলুকের একজন মনে হয়। যা অসম্ভব। মূলত এখানে আরবী ব্যাকরণের ব্যাপার রয়েছে। উল্লেখিত বাক্যে যদি ‘استثناء متصل’ ‘ইসতিসনা মুত্তাসাল’ অর্থাৎ আগের শব্দ ও পরের শব্দ একই গোত্রীয় হয়, তাহলে সমস্যা দেখা দেবে। কেননা, মাখলুক আর আল্লাহ সমগোত্রীয় হতে পারে না। আর যদি ‘استثناء منقطع’ ‘ইসতিসনা মুনকাতি’ অর্থাৎ আগের শব্দ ও পরের শব্দ সমগোত্রীয় না হয়, তাহলে আর সমস্যা থাকে না। তখন এর মূল কথা দাঁড়ায়, ‘আমার সাথে কোনো মাখলুক ছিল না, তবে আল্লাহ ছিলেন।’ আর এই ধারণা নেওয়া হয়েছে পবিত্র কুরআন হতে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

“وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ”

‘আর তোমরা যেখানেই থাকো, তিনি তোমাদের সাথে আছেন।’<sup>১১০</sup>

আর এ জন্য উল্লেখিত বাক্যের পরিবর্তে এভাবে বলাও উত্তম যে,

مَا كَانَ مَعِيَ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

অর্থাৎ, আমার সাথে আদ্বাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা ব্যতীত আর কেউ ছিল না।

ইমাম নাহহাসের মতে উলামায়ে কেরাম ‘إِجْلِسْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ’ আমি আদ্বাহ নামের ওপর বসলাম’ বলাকেও মাকরুহ বলেছেন; বরং উত্তম হলো এভাবে বলা, ‘إِجْلِسْ بِاسْمِ اللَّهِ’ আমি আদ্বাহর নামে বসলাম।

### ইবাদতের কসম করা

ইমাম নাহহাস (رحمه الله) পূর্ববর্তী কিছু উলামায়ে কেরাম হতে বর্ণনা করেন, রোজাদার ব্যক্তির জন্য এরূপ বলা মাকরুহ যে, ‘আমার মুখে পড়া মোহরের (রোজার কারণে পানাহার নিষিদ্ধ হওয়ার) কসম’। এর প্রমাণ হলো, আদ্বাহ তাআলা শুধু কাফেরের মুখেই মোহর (সিল) মারার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তবে ইবাদতের নামে কসম খাওয়া মাকরুহ হওয়ার ব্যাপারে দলিল হিসাবে ‘মোহর’-জাতীয় উদাহরণ বিতর্কের অবকাশ রাখে; বরং তা দুই কারণে মাকরুহ।

১. গাইরুদ্বাহ অর্থাৎ মাখলুকের নামে কসম খাওয়া নিষেধ। যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

২. বিনা প্রয়োজনে নিজের রোজা বা অন্যান্য ইবাদতকে প্রকাশ করা মাকরুহ।

### জাহিলী যুগের শব্দ ব্যবহার

জাহিলী যুগের শব্দ ব্যবহারে নিষেধের ব্যাপারে ইমাম আবু দাউদ (رحمه الله) সাহাবী ইমরান বিন হুসাইন (رحمه الله)-এর বর্ণনা উল্লেখ করেন, তিনি বলেন, كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا، وَأَنْعَمَ صَبَاحًا، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ نُهَيْتُمْ عَنْ ذَلِكَ



‘জাহিলী যুগে আমরা বলতাম, আল্লাহ আপনার মাধ্যমে অন্যের চক্ষুকে শীতল করে দিন, আল্লাহ আপনার প্রভাতকে উত্তম করে দিন। অতঃপর যখন ইসলাম এল, আমাদের এসব করতে নিষেধ করা হলো।’<sup>১১১</sup>

এই হাদীসের একজন রাবী আব্দুর রাজ্জাক (রহিমুল্লাহ) তার পূর্ববর্তী রাবী মামার (রহিমুল্লাহ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ‘أَنْتُمْ اللَّهُ بِكُمْ عَيْنًا’ অর্থাৎ ‘আল্লাহ তাআলা আপনার মাধ্যমে অন্যের চক্ষুকে শীতল করে দিন’ বলা মাকরুহ। তবে ‘أَنْتُمْ اللَّهُ عَيْنُكَ’ অর্থাৎ ‘আল্লাহ তাআলা আপনার চক্ষুকে শীতল করে দিন’ বলা মাকরুহ নয়।

ইমাম নববী (রহিমুল্লাহ) বলেন, ইমাম আবু দাউদ (রহিমুল্লাহ)-এর বর্ণনায় ‘عن قتادة او’ অর্থাৎ ‘কাতাদা (রহিমুল্লাহ) বা অন্য কারও হতে’ বাক্য ব্যবহার করেছেন। আর হাদীস-শাস্ত্রবিদগণ এ ধরনের শব্দ ও বাক্যবিশিষ্ট হাদীসকে সহীহ বলে সিদ্ধান্ত দেন না। কেননা, উল্লেখিত হাদীসে ‘কাতাদা (রহিমুল্লাহ)’ তো বিখ্যাত ও গ্রহণযোগ্য। কিন্তু অন্যান্যরা অজ্ঞাত। আর এই অজ্ঞতার দরুন হাদীসটি দ্বারা শরীয়তের কোনো বিধান প্রমাণ করা যায় না। তবে মানুষের জন্য সতর্কতামূলক এ ধরনের শব্দ ব্যবহার হতে বিরত থাকা উচিত। কেননা, এই হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকলেও কোনো কোনো আলেম এরূপ অজ্ঞাত বর্ণনা দ্বারাও দলিল দিয়েছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

**তিন জনের উপস্থিতিতে দুজন কানে কানে কথা বলা মাকরুহ**

৭৯. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রহিমুল্লাহ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,  
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَنْجَى رَجُلَانِ دُونَ الْآخِرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنْ ذَلِكَ يُخْزِنُهُ

<sup>১১১</sup>. আবু দাউদ: ৫২২৭; মুনজির (রহিমুল্লাহ)-এর মতে হাদীসটি ‘মুনকাতি’ তথা এর সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কাতাদা (রহিমুল্লাহ) ইমরান বিন হুসাইন (রহিমুল্লাহ) হতে হাদীসটি সরাসরি শুনেছেন বলে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।

‘যখন তোমরা তিন জন লোক একত্র হবে, তখন একজনকে রেখে দুজন কানাঘুষা করবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সাথে আরও লোক মিলিত না হয়। কেননা, এতে ওই ব্যক্তি মনঃক্ষুণ্ণ হতে পারে।’<sup>১৯২</sup>

৮০. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেন,  
 "ذَا كَانُوا ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ"

‘যখন কোথাও তিন জন মানুষ থাকবে, সেখানে তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে দুজন যেন কানে কানে কথা না বলে।’

আবু দাউদের বর্ণনায় অতিরিক্ত এই বক্তব্যও আছে, ‘উক্ত হাদীসের একজন রাবী আবু সালেহ (رضي الله عنه) ইবনে উমর (رضي الله عنه)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আর যদি সেখানে চার জন থাকে?’ তিনি বললেন, ‘তাহলে সমস্যা নেই।’<sup>১৯৩</sup>

**শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া নিজের স্বামী বা অন্য কোনো পুরুষের  
 নিকট কোনো নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা করা মাকরুহ**

৮১. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,  
 "لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَنْتَعَهَا لِرُؤُوسِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا"

‘কোনো নারী যেন অন্য নারীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর বর্ণনা নিজের স্বামীর কাছে এমনভাবে না দেয়, যেন সে (পুরুষ) তাকে (নারীকে) দেখতে পাচ্ছে।’<sup>১৯৪</sup>

**নবদম্পতিকে ‘সুখ ও সন্তান লাভের’ আশীর্বাদ জানানো মাকরুহ**  
 নবদম্পতিকে ‘بِالرِّفَاءِ وَالنِّينِ’ অর্থাৎ ‘সুখী হও ও সন্তান লাভ করো’ বলে আশীর্বাদ করা মাকরুহ; বরং তাদের জন্য এই বলে দুআ করবে,

১৯২. বুখারী: ৬২৯০; মুসলিম: ২১৮৩

১৯৩. বুখারী: ২৬৮৮; মুসলিম: ২১৮৪; আবু দাউদ: ৪৮৫২

১৯৪. বুখারী: ৫২৪০



‘আল্লাহ তাআলা তোমাকে বরকত দান করুন এবং তোমার ওপর বরকত নাজিল করুন’। ইমাম নববী (رحمہ اللہ) এই গ্রন্থের (আল আযকারের) বিবাহ অধ্যায়ে বরকতের দুআ-বিষয়ক দুটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।<sup>১১৫</sup>

তবে উক্ত হাদীসদ্বয়ে সুখ ও সন্তান লাভের দুআ করা মাকরুহ হওয়ার কথা নেই। তা রয়েছে অন্য হাদীসে। পাঠকের জ্ঞাতার্থে হাদীসটি সংযোজন করা হলো :

হাসান (رحمہ اللہ) হতে বর্ণিত আছে,

تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، امْرَأَةً مِنْ بَنِي جَنِّمٍ، فَقِيلَ لَهُ: بِالرِّفَاءِ وَالنِّينِ، قَالَ: قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ، وَبَارَكَ لَكُمْ

‘আকীল বিন আবু তালিব (رحمہ اللہ) ‘বনু জাছিমের’ এক মহিলাকে বিয়ে করলেন। তখন এই বলে তার জন্য দুআ করা হলো, ‘بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَبَارَكَ لَكُمْ’ সুখ ও সন্তান লাভ করো। তখন তিনি বললেন, ‘তোমরা এমনভাবে বলো যেভাবে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, তিনি বলেছেন,

بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ، وَبَارَكَ لَكُمْ

আল্লাহ তাআলা তোমাকে বরকত দান করুন এবং তোমার ওপরে বরকত নাজিল করুন।’<sup>১১৬</sup>

‘রিফা’ এর শাব্দিক অর্থ ‘মিলন ও সহবাস’। জাহিলী যুগে আরবে নবদম্পতিকে সুখ লাভের দুআর জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হতো।

### ক্রোধান্বিত ব্যক্তিকে উপদেশ দান

ইমাম নাহহাস (رحمہ اللہ) বিশিষ্ট ফিকাহশাস্ত্রবিদ, বরেন্য আলিম ও প্রথিতযশা আরবী সাহিত্যিক আবু বকর মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া (رحمہ اللہ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ‘মানুষ যখন ক্রোধোন্মাদ হয়ে পড়ে, তখন তাকে ‘أَذْكُرِ اللَّهَ’

<sup>১১৫</sup> বরকতের দুআটি দুটি হাদীসে আছে। বুখারী: ৫১৫৫ ও মুসলিম: ১৪২৭, আনাস (رحمہ اللہ) হতে।

<sup>১১৬</sup> নাসায়ী: ২১৭৩, ৩৩৭১; ইবনে মাজাহ: ১৯০৬; আহমদ: ১৭৪০, ১৫৩১৩

تَنَالِي 'আল্লাহ তাআলার স্মরণ করো' জাতীয় উপদেশ দেওয়া মাকরুহ। কেননা, এমতাবস্থায় রাগের বশবর্তী হয়ে তার কাফের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণের আহ্বানের প্রত্যুত্তরে রাগের বশবর্তী হয়ে সে হয়তো এমন কথা বলে দেবে, যদরুন্ন সে কাফের হয়ে যাবে। একই আশঙ্কার দরুন তাকে, 'صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ' 'নবীজি (ﷺ)-এর ওপর দুরুদ পাঠ করো' জাতীয় উপদেশ প্রদান করাও মাকরুহ।

## আল্লাহ জানেন 'এমন হয়েছে বা হয়নি'

### এ-জাতীয় কথা বলা নিষেধ

কথায় কথায় কসম খাওয়ার জন্য, বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে বা আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশার্থে অথবা আত্মরক্ষার্থে 'وَاللَّهِ' 'আল্লাহর কসম' বলা খুবই আপত্তিকর ও নিন্দনীয়, যা কিনা অধিকাংশ মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এমনিভাবে কসম থেকে বিরত থাকতে ওপরের অন্যান্য স্বার্থে

'اللَّهُ يَعْلَمُ مَا كَانَ كَذًا، أَوْ لَقَدْ كَانَ كَذًا' 'আল্লাহ জানেন যে, এমন কিছু ছিল না বা এমন কিছু ছিল' এ-জাতীয় কথা বলাও আপত্তিকর ও নিন্দনীয়।

এ ধরনের কথায় কিছু আশঙ্কা দেখা দেয়।

যেমন : বক্তা যদি তার বক্তব্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকে যে, সে যা বলেছে বাস্তবতাও তা-ই। তবে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যদি তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে, তবে তা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও মন্দ কাজ। কেননা, এতে আল্লাহ তাআলার প্রতি মিথ্যার ইঙ্গিত করা হয়। এ ধরনের কথা দ্বারা বক্তা যেন এ সংবাদ দিচ্ছে, আল্লাহ তাআলা বিষয়টা এমন জানেন অথচ সে নিজে তা বিশ্বাস করে না। এ ছাড়াও এ ধরনের কথায় আরেকটি সূক্ষ্ম আপত্তি দেখা দেয়। তা এই যে, আল্লাহ তাআলা উল্লেখিত বিষয়টি সম্পর্কে বাস্তবের বিপরীত জানেন (নাউজবিলাহ)। আর



নিশ্চিতরূপে কেউ যদি আল্লাহ তাআলার ইলম সম্পর্কে বাস্তবতার বিপরীত কথা বলে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। সুতরাং এ ধরনের শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার হতে সকলেরই বিরত থাকা উচিত।

### আল্লাহ তাআলাকে ইচ্ছাধিকার দিয়ে দুআ করা মাকরুহ

কারও জন্য দুআর মধ্যে আল্লাহ তাআলাকে ইচ্ছাধিকার দেওয়ার মতো শব্দ ব্যবহার করা মাকরুহ। যেমন : 'اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، أَوْ إِنْ أَرَدْتَ' : 'হে আল্লাহ, আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করে দিন' এভাবে দুআ না করে বরং পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থার সাথে দুআ করতে হবে।

৮২. আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيُغْزِمَ الْمَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لَا مُكْرَهَ لَهُ"

'তোমাদের কেউ যেন এ কথা না বলে যে, 'হে আল্লাহ, আপনি ইচ্ছা হলে আমাকে ক্ষমা করে দিন', 'হে আল্লাহ, আপনি ইচ্ছা হলে আমার প্রতি দয়া করুন'; বরং সে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দুআ করবে। কেননা, আল্লাহকে বাধ্য করার মতো কেউ নেই।'

মুসলিম শরিফের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে,

وَلَكِنْ لِيُغْزِمَ الْمَسْأَلَةَ وَلِيُعْظِمَ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أُعْطَاهُ

'বরং দৃঢ় বিশ্বাস এবং ব্যাপক আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে দুআ করবে। কেননা, আল্লাহ তাআলার নিকট এমন কোনো বড় বিষয় নেই, যা তিনি দিতে পারেন না। অর্থাৎ তিনি সবই দিতে পারেন।''

৮৩. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেন,

"إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيُغْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، وَلَا يَقُولَنَّ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرَهَ لَهُ"

‘তোমাদের কেউ যখন দুআ করে, সে যেন দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দুআ করে আর এ কথা না বলে, ‘হে আল্লাহ, আপনি ইচ্ছা হলে আমাকে দান করুন’। কেননা, আল্লাহকে বাধ্য করার মতো কেউ নেই।’<sup>১৯৮</sup>

### গাইরুল্লাহর (মাখলুকের) নামে কসম খাওয়া মাকরুহ

আল্লাহ তাআলার মূল নাম (আল্লাহ) ও গুণবাচক নাম ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নামে কসম খাওয়া মাকরুহ। হোক তা নবী-রাসূল, ফিরিশতা, আমানত, দেহ বা মন। যা-ই হোক অন্য নামে কসম খাওয়া মাকরুহ। আর এর মধ্যে আরও অপছন্দনীয় বিষয় হলো ‘মান্নতের কসম খাওয়া’।

৮৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْنُتْ"

‘আল্লাহ তাআলা তোমাদের পিতৃপুরুষের নামে কসম খেতে নিষেধ করেছেন। যদি কেউ কসম খেতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে কসম খায়, নতুবা চুপ থাকে।’<sup>১৯৯</sup>

আরেক সহীহ বর্ণনায় রয়েছে :

فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَسْكُتْ

অতএব যে কসম খেতে চায়, তাহলে সে যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে কসম না খায়। অথবা চুপ থাকে।<sup>২০০</sup>

এ ছাড়াও আমানতের কসম খাওয়া নিষেধ। এ ব্যাপারে বহু হাদীসও রয়েছে। তন্মধ্যে একটি নিম্নরূপ :

৮৫. বুরাইদা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا"

‘যে ব্যক্তি আমানতের কসম খায়, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।’<sup>২০১</sup>

১৯৮. বুখারী: ৬৩৩৮; মুসলিম: ২৬৭৮

১৯৯. বুখারী: ৬৬৪৬; মুসলিম: ১৬৪৬

২০০. সুনানে আবু দাউদ: ৩২৪৯

২০১. সুনানে আবু দাউদ: ৩২৫৩



## কেনাবেচায় কসম খাওয়া মাকরুহ

কেনাবেচাসহ যাবতীয় লেনদেনে সত্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও কসম খাওয়া মাকরুহ।

৮৬. আবু কাতাদা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন,

"إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْخَلْفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يَنْتَفِقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ"

সাবধান, তোমরা কেনাবেচায় বেশি কসম খেয়ো না। কেননা, তা (কসম) তোমার মাল তো বিক্রি করে দেবে, কিন্তু তার বরকত দূর করে দেবে।<sup>২০২</sup>

## রংধনুকে ‘قَوْسٌ قُرْحٌ’ শয়তানের ধনুক’ না বলা

৮৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"لَا تَقُولُوا: قَوْسٌ قُرْحٌ فَإِنَّ قُرْحَ شَيْطَانٍ وَلَكِنْ قُولُوا: قَوْسُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ"

‘তোমরা রংধনুকে ‘কাউসে কুয়াহ’ বোলো না। কেননা, ‘কুয়াহ’ হলো শয়তান; বরং তোমরা একে ‘কাউসুল্লাহ’ তথা ‘আল্লাহর ধনুক’ বোলো। আর তখন তা জমিনবাসীর জন্য নিরাপত্তার কারণ হবে।’<sup>২০৩</sup>

ইমাম নববী (رحمته الله) বলেন, শব্দটি ‘কুয়াহ্ন’ হবে। জাওহারীসহ অনেকেই তা বলেছেন। তখন এর অর্থ হবে ‘ঘুরে আসেনি’ এমন বস্তু অর্থাৎ অর্ধবৃত্তের মতো। আর সাধারণ মানুষ একে ‘কুদাহ্ন’ বলে থাকে। যার অর্থ ‘বিকৃত বা বাঁকা’।

২০২. সহীহ মুসলিম: ১৬০৭; নাসায়ী: ৭/২৪৬; ইবনে মাজাহ: ২২০৯

২০৩. আবু নুআইম (رحمته الله) প্রণীত হিলয়াতুল আওলিয়া: ২/৩০৯। হাদীসটি যঈফ। কারণ, এই হাদীসের সনদে ‘বিশর ইবনুল ওয়ালীদ’ নামক জনৈক রাবী রয়েছে, যার ব্যাপারে হাদীসশাস্ত্রের ইমামগণের কেউ কেউ কঠোর ভাষায় আপত্তি করেছেন।

## অন্যের নিকট নিজের দোষ বলে বেড়ানো নিষেধ

মানুষ যখন কোনো গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে তখন নিজ থেকে অন্যের কাছে তা বলে বেড়ানো মাকরুহ; বরং তার উচিত হলো এর জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে কায়মনোবাক্যে তওবা করা, তৎক্ষণাৎ এ ধরনের গুনাহ থেকে নিবৃত্ত হওয়া এবং কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। এ তিনটি হলো তওবার শর্ত। এ সকল শর্ত একত্রীভূত না হলে তওবা যথাযথভাবে সম্পন্ন হবে না। তবে কেউ যদি তার শাইখ বা এমন মুরশিদকে তার গুনাহের ব্যাপারে অবহিত করে, যে তাকে গুনাহের বৃত্ত থেকে বেড়িয়ে আসার পথ বাতলে দেবেন বলে আশা করা যায়। অথবা এই উদ্দেশ্যে অন্যকে গুনাহের কথা জানায়, যেন অন্য কেউ তাতে জড়িয়ে না যায়। অথবা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণ দর্শাতে কিংবা দুআর উদ্দেশ্যে কারও নিকট নিজের গুনাহের ফিরিস্তি তুলে ধরে, তবে তাতে ক্ষতি নেই। এমন করাটা বরং একটি উত্তম উদ্যোগ। আর মাকরুহ তখনই হবে যখন এর পেছনে কল্যাণ নিহিত থাকবে না।

৮৮. আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) বলেন, ‘আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি,  
 "كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ"

আমার সকল উম্মত মাফ পাবে, তবে প্রকাশকারীগণ ব্যতীত। নিশ্চয়ই অন্যতম ধৃষ্টতা হলো, কোনো ব্যক্তি রাতে গুনাহ করল, যা আল্লাহ গোপন রাখলেন। কিন্তু ভোর হতেই সে বলে বেড়াতে লাগল যে, ‘হে অমুক, আমি রাতে এমন এমন কাজ করেছি।’ অথচ সে এমন অবস্থায় রাত কাটিয়েছে যে, তার প্রতিপালক তার কর্ম গোপন রেখেছিলেন। আর ভোর হতেই সে আল্লাহর পর্দা সরিয়ে দিলো।’<sup>২০৪</sup>

২০৪. বুখারী: ৬০৬৯; সহীহ মুসলিম: ২৯৯০



## পরিবারের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করা হারাম

শরীয়তের আওতাভুক্ত কোনো ব্যক্তির জন্য অন্যের কৃতদাস, স্ত্রী, সন্তান কিংবা কর্মচারী ইত্যাদির নিকট তার সম্পর্কে এমন কথা বলা জায়েজ নেই যা উভয়ের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি করবে। তা স্পষ্ট হারাম। তবে সৎ কাজের আদেশ বা অসৎ কাজের নিষেধের অংশ হিসাবে এই ধরনের কার্যক্রম জায়েজ।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

‘তোমরা সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অপরকে সাহায্য করো, আর অন্যায় অপকর্মে একে অপরকে সাহায্য কোরো না।’<sup>২০৫</sup>

তিনি আরও বলেন :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

‘সে (মানুষ) যা-ই উচ্চারণ করে, তা-ই গ্রহণ (সংরক্ষণ) করার জন্য তার নিকট রয়েছে সদা প্রস্তুত প্রহরী।’<sup>২০৬</sup>

৮৯. আবু হুরাইরা (رضি) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةً أَمْرِي، أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنِّي"

‘যে ব্যক্তি কারও স্ত্রী বা গোলামের মধ্যে প্রতারণার মাধ্যমে বিবাদ সৃষ্টি করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।’<sup>২০৭</sup>

‘খব্ব’ শব্দের অর্থ বিবাদ সৃষ্টি করা বা প্রতারণা করা।

## কল্যাণকর খাতে ব্যয় করা অর্থকে জরিমানা মনে না করা

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় হয়, তাকে খরচ বা ব্যয়-জাতীয় শব্দে উল্লেখ করাই বাঞ্ছনীয়।

২০৫. সূরা মায়িদাহ, ৫ : ০২

২০৬. সূরা কাফ, ৫০ : ১৮

২০৭. সুন্নে আবু দাউদ : ২১৭৫, ৫১৭০; তুহফাতুল আশরাফ : ১৪৮১৭ (সুন্নে কুবরায় সূত্রে)

যেমন : আমি হজের সফরে এক হাজার টাকা খরচ করেছি, জিহাদের ময়দানে দুই হাজার টাকা ব্যয় করেছি, মেহমানদারিতে এত টাকা খরচ করেছি, বাচ্চার সুন্নাতে খাতনা বা বিবাহে এত এত টাকা খরচ করেছি ইত্যাদি। এ ধরনের কল্যাণকর খাতসমূহে খরচ করে সাধারণ মানুষের মতো নেতিবাচক ভাষায় তার বর্ণনা না দেওয়া। যেমন : মেহমানদারিতে এত টাকা জরিমানা দিলাম, হজে এত টাকা খোয়ালাম বা সফরে এত টাকা নষ্ট করলাম ইত্যাদি। মূলকথা হলো ইবাদত, আনুগত্য ও কল্যাণের কাজে অর্থ ব্যয় হলে তাকে খরচ বা ব্যয় ইত্যাদি ইতিবাচক শব্দে উল্লেখ করা উচিত। আর জরিমানা, গচ্চা বা অপব্যয় ইত্যাদি শব্দ গুনাহ ও অপছন্দনীয় কাজে ব্যয় হওয়া অর্থের ব্যাপারে প্রয়োগ করা উচিত; উত্তম কাজে নয়।

### মুক্তাদির জন্য ইমামের তিলাওয়াত পুনরাবৃত্তি করা নিষেধ

অনেক মানুষ আছেন, যারা ইমামের তিলাওয়াতের পুনরাবৃত্তি করে থাকেন। এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন : ইমাম যখন ‘إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ’ বলেন, তখন মুক্তাদীগণও তার পুনরাবৃত্তি করেন। এ অভ্যাস ত্যাগ করে তা থেকে বিরত থাকা উচিত। শাফেয়ী মাজহাবের আলেমগণের মধ্য হতে আল-বায়ান কিতাবের গ্রন্থকার বলেন, ‘তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে শুধু ইমামের তিলাওয়াত পুনরাবৃত্তির ইচ্ছায় এমন কিছু করলে নামাজ ভেঙে যাবে।’<sup>২০৮</sup>

তার এ বক্তব্যে যদিও আপত্তির অবকাশ রয়েছে। এবং বাস্তবতাও এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তদুপরি তা পরিহার কর উচিত। কেননা, এতে নামাজ ভঙ্গ না হলেও মাকরুহ অবশ্যই হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।



**খাজনা আদায় করাকে ন্যায়সংগত মনে করা নিষেধ**  
 ক্রেতা ও বিক্রেতার নিকট হতে খাজনা আদায়ের যে প্রচলন রয়েছে তা অন্যায়। একে ন্যায়সংগত মনে করা নিষেধ। এবং সাধারণ ও মূর্খ লোকদের নিকট একে 'বাদশাহর হক' বা 'তোমাদের ওপর বাদশাহর হক রয়েছে' ইত্যাদি এমন বাক্যে উপস্থাপন করা নিষেধ, যদ্বারা এ ধরনের খাজনাকে ন্যায়সংগত বা আবশ্যিক মনে হয়। কেননা, তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও নিকৃষ্টতম নব-প্রচলন। এমনকি কতিপয় আলেমের মতে যে ব্যক্তি একে ন্যায়সংগত বলবে, সে কাফের। মুসলিম জাতিগোষ্ঠী থেকে আলাদা। তবে বিশুদ্ধ মত হলো, এমন ব্যক্তি কাফের নন। যদিও এমন ব্যক্তি এ ধরনের খাজনা আদায় অন্যায় হওয়া সত্ত্বেও একে ন্যায় মনে করে থাকে। সঠিক কথা হলো একে 'খাজনা' বা বাদশাহর পক্ষ হতে আরোপিত কর ইত্যাদি বলবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

### আল্লাহর নাম নিয়ে কিছু চাওয়া

আল্লাহর নাম নিয়ে জান্নাত ব্যতীত অন্যকিছু চাওয়া মাকরুহ।

৯০. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,  
 "لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ، إِلَّا الْجَنَّةُ"

'আল্লাহর নাম নিয়ে জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু চাওয়া উচিত নয়।'<sup>২০৯</sup>

### আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু চাওয়ার বিধান

৯১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে  
 "مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ،  
 وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَغْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ  
 حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ"

ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে আশ্রয় প্রার্থনা করে তোমরা তাকে আশ্রয় দাও। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কিছু চায় তোমরা তাকে দান করো। যে

২০৯. সুনানে আবু দাউদ: ১৬৭১, হাদীসটি বর্ণনাকারী 'সুলাইমান বিন মুআজ্জের' দুর্বল স্মরণশক্তির কারণে যঈফ।

তোমাদের আহ্বান করে তোমরা তার ডাকে সাড়া দাও। আর যে তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে তোমরা তার বিনিময় দাও। যদি বিনিময় দিতে সক্ষম না হও তবে তার জন্য দুআ করো। যাতে তোমরা অনুভব করতে পারো যে, তোমরা তার বিনিময় দিয়েছ।<sup>১১০</sup>

### ‘আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন’ বলা মাকরুহ

প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী কাউকে ‘اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ’ ‘আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন’ বলা মাকরুহ।

ইমাম আবু জাফর নাহহাস (رحمته الله) তার সনাআতুল কুতাব গ্রন্থে বলেছেন, ‘কিছু আলেম ‘দীর্ঘজীবী’ হওয়ার দুআকে মাকরুহ বলেছেন আর কিছু আলেম একে জায়েজ বলেছেন।’<sup>১১১</sup>

ইসমাইল বিন ইসহাক (رحمته الله) বলেন, ‘অবিশ্বাসী নাস্তিকরাই সর্বপ্রথম চিঠিপত্রে ‘اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ’ ‘আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন’ লেখার সূচনা করে।

হাম্মাদ বিন সালাম (رحمته الله) হতে বর্ণিত আছে, ‘মুসলমানদের চিঠিপত্র ছিল এরূপ :

অমুকের পক্ষ হতে অমুকের প্রতি, অতঃপর, তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, আমি তোমার নিকট সেই মহান সত্তার প্রশংসা করছি, যিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। এবং তাঁর নিকট মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তার পরিবর্গের প্রতি দুরুদ ও সালামের নিবেদন করছি।

পরবর্তীকালে অবিশ্বাসী নাস্তিকরা সালামের পরিবর্তে দীর্ঘজীবী হওয়ার বাক্য জুড়ে দেওয়ার নতুন প্রচলন ঘটায়।’<sup>১১২</sup>

১১০. আবু দাউদ: ১৬৭২; নাসায়ী: ২৫৬৭

১১১. সনাআতুল কুতাব: ২৪২-২৪৩

১১২. সনাআতুল কুতাব: ২৪৫



‘আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক’ বলা জায়েজ সঠিক ও নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী কারও প্রতি নিজেকে বা নিজের পিতা-মাতাকে উৎসর্গ করার মতো বাক্য ব্যবহার করা কোনোরকম মাকরুহ ব্যতীতই জায়েজ। যেমন : ‘فَذَاكَ أَبِي وَأُمِّي’ ‘আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক’ বা ‘جَعَلَنِي اللَّهُ فِذَاكَ’ ‘আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার জন্য জীবনোৎসর্গকারী বানিয়ে দিন।’

বুখারী-মুসলিমসহ হাদীসের অন্যান্য কিতাবেও অনেক বিখ্যাত হাদীসেও এর স্বপক্ষে দলিল রয়েছে। উৎসর্গকারীর পিতা-মাতা মুসলমান হোক বা কাফের, তাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে কোনো কোনো আলেমের মতে মুসলিম পিতা-মাতার ক্ষেত্রে এ ধরনের বাক্য বলা মাকরুহ।

নাহাস (رضي الله عنه) বলেন, ‘মালিক বিন আনাস (رضي الله عنه)-এর মতে ‘আল্লাহ আমাকে আপনার প্রতি আত্মোৎসর্গকারী বানিয়ে দিন’ বলা মাকরুহ। তবে কেউ কেউ তা জায়েজ বলেছেন।’<sup>১৩৩</sup>

কাজী আইয়াজ (رضي الله عنه) বলেন, ‘জুমহুর উলামায়ে কেরামই একে জায়েজ বলেছেন। যাকে উৎসর্গের কথা বলা হয় সে মুসলমান হোক বা কাফের।’

ইমাম নববী (رضي الله عنه) বলেন, ‘এ ধরনের বাক্য জায়েজ হওয়ার স্বপক্ষে এত বেশি হাদীস রয়েছে যে, তা গণনা করা দুঃসাধ্য। আমি সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় রচিত আমার শরহ সহীহ মুসলিম গ্রন্থে এ বিষয়ক কিছু বাক্যের বিশ্লেষণ করেছি।’<sup>১৩৪</sup>

### ঝগড়া, বিবাদ ও শত্রুতার নিন্দা

আরও কিছু নিন্দনীয় শব্দ হলো ‘مِرَاءٍ’ ‘মিরাউন’ ‘ঝগড়া’, ‘جِدَالٍ’ ‘জিদালুন’ ‘বিবাদ’ ও ‘مُخَصُّمَةٍ’ ‘খুসুমাতুন’ ‘শত্রুতা’। শব্দ তিনটি একে অপরের সমার্থবোধকও বটে।

১৩৩. সনাআতুল কুতাব: ২৪৩

১৩৪. শরহ সহীহ মুসলিম: ৫/১৮৪

তবে ইমাম আবু হামিদ গাজালী (رحمہ اللہ) উল্লেখিত শব্দত্রয়ের আলাদা আলাদা সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

‘مراءٍ বা ঝগড়া হলো কারও ত্রুটি প্রকাশ করার জন্য তার কথায় দোষ ধরা। তাকে হেয় করে তার ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করাই যার মূল উদ্দেশ্য।

‘جدالٍ বিবাদ বা বিতর্ক হলো এমন বিষয়ে ঝগড়া করা, যার সাথে নিজের মতবাদকে প্রকাশ ও তা প্রমাণ করার সম্পর্ক রয়েছে।

আর ‘خصومة’ শত্রুতা বা বিরোধিতা হলো অভীষ্ট লক্ষ্যপূরণে অর্থাৎ সহায়-সম্পত্তি দখলের জন্য নিজের মতামতকে চাপিয়ে দেওয়া এবং এর ওপর জিদ ধরা।

উল্লেখিত তিনটির মধ্যে ‘خصومة’ তথা শত্রুতা প্রথমে কিংবা মাঝেও হতে পারে। তবে প্রথমোক্ত ‘مراءٍ’ অর্থাৎ ঝগড়া কেবল মাঝেই হতে পারে।

অর্থাৎ এই তিনটির মাঝে শত্রুতা শুরু থেকেই হতে পারে আবার পরবর্তী সময়ও হতে পারে। তবে শত্রুতা বা বিরোধিতা দেখা দিলেই ঝগড়া হয়।

আর এসবের সূত্রপাত বিতর্ক থেকে হতে পারে। আবার অন্য দুটি ঘটনার কারণেও বিতর্ক হতে পারে। এটাই ইমাম গাজালী (رحمہ اللہ)-এর অভিমত।<sup>২৫</sup>

আর বিবাদ-বিতর্ক ন্যায় এবং অন্যায় উভয়ের জন্যই হতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

‘وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ’

‘তোমরা ‘কিতাবধারীদের’ সাথে বিতর্কে জড়াবে না, তবে উত্তম পন্থায়।’<sup>২৬</sup>

তিনি আরও বলেন :

‘وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ’

‘এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়।’<sup>২৭</sup>

২৫. ইহইয়াউ উলুমুদ দীন: ৩/১১৭ (উক্ত গ্রন্থে শব্দত্রয়ের সংজ্ঞা আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।)

২৬. সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৪৬

২৭. সূরা নাহল, ১৬ : ১২৫



অন্যত্র বলেন :

‘مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا’

‘কেবল কাফিররাই আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে।’<sup>১১৮</sup>

ঝগড়া-বিবাদ যদি সত্য প্রতিষ্ঠা বা প্রমাণের জন্য হয় তবে প্রশংসার দাবিদার। আর যদি সত্যকে মিটিয়ে দিতে বা অজ্ঞতাবশত হয়, তবে তা নিন্দনীয়।

গ্রন্থকার বলেন, ‘ঝগড়া-বিবাদ বৈধ ও নিন্দনীয় হওয়ার প্রমাণসমূহ উভয় সম্ভাবনায় বিভক্ত। আর ‘الْجِدَالُ’ ও ‘الْمُجَادَلَةُ’ সমার্থবোধক। বিষয়টি আমি তাহজীবুল আসমাই ওয়াল লুগাত গ্রন্থে সবিস্তারে উল্লেখ করেছি।’<sup>১১৯</sup>

অনেকেই বলেন, দ্বীন বিনষ্টে, ব্যক্তিত্ব খর্বে, ঈমানের স্বাদ বরবাদে এবং অন্তরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে ঝগড়া-বিবাদের চেয়ে খারাপ কিছু হতে পারে না। কেউ যদি আপত্তি করে যে, অধিকার রক্ষায় বা আদায়ে বিরোধ-বিবাদের বিকল্প নেই। তার জবাবে তা-ই বলা যায়, যা ইমাম গাজালী (رحمته) বলেছেন। তিনি বলেন, ‘নিশ্চয়ই অন্যায়ের পক্ষে এবং জ্ঞানশূন্য ঝগড়া, বিবাদ ও বিরোধিতা অত্যন্ত নিন্দনীয়।’ যেমন বিচারকার্যে কোনো কোনো উকিল কোন পক্ষ সত্যের ওপর রয়েছে তা না জেনেই বিবাদে জড়িয়ে পড়ে।

এ ধরনের নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডের অন্যতম আরেকটি হলো, বাদী তার বিবাদকে শুধু অধিকার আদায়ে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রতিপক্ষের ওপর কর্তৃত্ব জাহির ও তাকে কষ্ট দেওয়ার হীন উদ্দেশ্যে অমূলক মিথ্যা ও তীব্র বিবাদের পথ বেছে নেয়। (যেমন : মামলা দীর্ঘায়িত করা, কিছু মিথ্যা মামলা ঠুকে দেওয়া ইত্যাদি।)

<sup>১১৮</sup> সূরা মুমিন, ৪০ : ০৪, সূরাটি ‘গাফির’ নামেও পরিচিত।

<sup>১১৯</sup> তাহজীবুল আসমাই ওয়াল লুগাত : ২/৪৮ (শামেলাতে ৩/৪৮)

এমনিভাবে অধিকার আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা-বহির্ভূত কথাবার্তা দ্বারা প্রতিপক্ষকে কষ্ট দেওয়া এবং শুধু জেদের বশবর্তী হয়ে কঠোর ভাষায় প্রতিপক্ষকে তুলোধুনো করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

তবে কোনো নিপীড়িত বা অধিকারবঞ্চিত ব্যক্তি যদি তার শরীয়তসম্মত অধিকার আদায়ে কোনোরূপ কঠোরতা, অতিরঞ্জন, একগুঁয়েমি ও কষ্টদানের পথ অবলম্বন না করে সত্যের ওপর অটল থেকে বিবাদে জড়ায়, তাহলে তা হারাম হবে না। তদুপরি বিকল্প কোনো পথ খোলা থাকলে বিবাদের পথ ত্যাগ করাই শ্রেয়। কেননা, ঝগড়া-বিবাদের সময় জিহ্বাকে সংযত রাখা নিতান্তই দুঃসাধ্য ব্যাপার।

ঝগড়া-বিবাদ অন্তরে জ্বালা সৃষ্টি করে এবং ক্রোধ উসকে দেয়। আর যখন ক্রোধ বৃদ্ধি পায় তখন উভয়ের মাঝে প্রতিহিংসার সূত্রপাত হয়। এতে করে একে অন্যের দুঃখে খুশি এবং সুখে দুঃখী হয়। আর জিহ্বা তা প্রকাশে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। মোটকথা হলো যে-ই ঝগড়া-বিবাদে জড়াবে সে এ সকল বিপদে নিপতিত হবে। অন্তত তার অন্তর এতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে। এমনকি নামাজের মধ্যেও সে এই ঝগড়া-বিবাদ ও এর পক্ষে-বিপক্ষের যুক্তি ইত্যাদিতে মনোযোগী হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন আর তার মধ্যে কোনোরূপ স্থিরতা থাকে না।

ঝগড়া-বিবাদসহ শুরুতে উল্লেখিত তিনটি শব্দই সকল মন্দ কাজের সূচনা করে। তাই সকলেরই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত, অত্যাবশ্যকীয় কোনো প্রয়োজন ছাড়া তার সামনে যেন ঝগড়া-বিবাদের দ্বার উন্মুক্ত না হয়। এতে করে জিহ্বা ও অন্তরও ঝগড়া-বিবাদের বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

৯২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"كَفَى بِكَ إِثْمًا أَنْ لَا تَزَالَ مُخَاصِمًا"

‘তোমার গুনাহগার হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট, তুমি সর্বদা ঝগড়ায় লিপ্ত থাকো।’<sup>২২০</sup>

২২০. তিরমিযী: ১৯৯৪, ‘ইবনে ওহাব বিন মুনাবিহ’ নামক রাবী অজ্ঞাত হওয়ার কারণে হাদিসটি যঈফ।



আলী (ؓ) বলেন,

إِنَّ لِلْخُصُومَاتِ قَحْمًا

‘ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে ধ্বংস রয়েছে।’<sup>২২১</sup>

‘আল-কুহামু’ শব্দের অর্থ ধ্বংসস্থল।

### যেভাবে কথা বলা মাকরুহ

চিবিয়ে, গাল ভরে, হৃন্দ মিলিয়ে, কৃত্রিম অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে অলংকার-শাস্ত্রবিদ ও বিশুদ্ধভাষীদের মতো করে কথা বলা মাকরুহ। মূলকথা হলো কথাবার্তায় কোনোরূপ কৃত্রিমতার আশ্রয় নেওয়া মাকরুহ। তেমনিভাবে সাধারণ মানুষের সাথে কথোপকথনের সময় সূক্ষ্ম ব্যাকরণ-জ্ঞান বজায় রেখে এবং অপ্রচলিত দুর্বোধ্য শব্দের ব্যবহারে কথা বলা মাকরুহ ও নিন্দনীয়। তাদের সাথে বরং এমন সহজ বোধগম্য ভাষায় কথা বলা উচিত, যা তাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না।

৯৩. আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (ؓ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"إِنَّ اللَّهَ يَغْضُ الْبَلِيعَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقْرَةُ"

‘লোকদের মধ্যে যে ভাষাবিদ তার ভাষার ব্যবহারে গরুর জাবর কাটার মতো অতিরঞ্জন করে, আল্লাহ তাকে অপছন্দ করেন।’<sup>২২২</sup>

তিরমিযী (ؒ) বলেন, ‘হাদীসটি হাসান।’

৯৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (ؓ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ" قَالَهَا ثَلَاثًا

‘সীমালঙ্ঘনকারীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি এ কথা তিনবার বলেন।’<sup>২২৩</sup>

২২১. কানযুল উম্মাল: ১৫৩৩৩

২২২. আবু দাউদ: ৫০০৫; তিরমিযী: ২৮৫৩

২২৩. সহীহ মুসলিম: ২৬৭০; সুনানে আবু দাউদ: ৪৬০৮

উলামায়ে কেরাম বলেন ‘مَنْطُفُونَ’ অর্থ কোনো কাজে বাড়াবাড়ি করা। তবে রিয়াযুস সালিহীনে গ্রন্থকার এই শব্দের অর্থ করেন ‘অপাত্রে কঠোরতা অবলম্বন করা’।<sup>২২৪</sup>

৯৫. জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرَثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيِّهُونَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا الثَّرَثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَيِّهُونَ؟ قَالَ: الْمُتَكَبِّرُونَ"

তোমাদের যে ব্যক্তির চরিত্র ও আচরণ সর্বোত্তম তোমাদের মধ্যে সে-ই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার সর্বাধিক নিকটে থাকবে। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার নিকট সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত সে কিয়ামতের দিন আমার নিকট হতে সবচেয়ে বেশি দূরে থাকবে। তারা হলো বাচাল, ধৃষ্ট-নির্লজ্জ ও ‘মুতাফাইহিকুন’ ব্যক্তিরা। সাহাবীগণ (رضي الله عنهم) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বাচাল ও ধৃষ্ট-নির্লজ্জদের আমরা জানি, কিন্তু ‘মুতাফাইহিকুন’ কারা? তিনি বললেন, দাস্তিক অহংকারীগণ।<sup>২২৫</sup>

ইমাম তিরমিযী (رحمته الله) বলেন ‘হাদীসটি হাসান।’

‘الثَّرَثَارُ’ অর্থ বেশি কথা। এবং ‘الْمُتَشَدِّقُ’ অর্থ লম্বা লম্বা কথা বলা, নির্লজ্জ ও অশ্লীল গালাগাল করা।

জেনে রাখা দরকার, বক্তৃতা কিংবা ওয়াজ-নসিহত ইত্যাদিতে অতিরঞ্জন ও অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ ব্যতিরেকে সুন্দর শব্দসজ্জায় বক্তব্য উপস্থাপন করা মোটেও নিন্দনীয় নয়। কেননা, ওয়াজ-নসিহত ও দ্বীনি বক্তৃতা

২২৪. রিয়াযুস সালিহীন: ১৪৪

২২৫. তিরমিযী: ২০১৮, হাদীসটির একজন রাবী ‘মুবারক বিন ফুজালা’ মুদাল্লিস হওয়া সত্ত্বেও সে এই হাদীসে সহীহ সাব্যস্ত। তাই হাদীসটি সহীহ।



ইত্যাদির উদ্দেশ্য হলো মানুষের অন্তরকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। আর সুন্দর শব্দের স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে।

### ইশার নামাজের পর অনর্থক কথাবার্তা বলা মাকরুহ

যে ব্যক্তি ইশার নামাজ আদায় করেছে। তার জন্য ইশার পর এমন কথায় লিপ্ত হওয়া মাকরুহ, যা অন্য সময় বলা বৈধ। মুবাহ বা বৈধ শব্দ দ্বারা এমন কথা ও কাজকে বোঝানো হয় যা করা বা না-করা এবং বলা বা না-বলা উভয়ই সমান। অর্থাৎ এতে সাওয়াব বা গুনাহ কিছুই নেই। নতুবা অন্যান্য সময় যা করা হারাম বা মাকরুহ, ইশার পর তা করা অপেক্ষাকৃত গুরুতর হারাম ও মাকরুহ।

এ সময়ে উত্তম কথাবার্তা বলা মাকরুহ নয়। যেমন: জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গের আলোচনা, চারিত্রিক উৎকর্ষের আলোচনা ও মেহমানের সাথে খোশালাপ ইত্যাদি। এসব আলোচনা করা মাকরুহ তো নয়ই; বরং মুস্তাহাব। এ বিষয়ক অসংখ্য হাদীস রয়েছে। তবে অপারগতাবশত বা আচমকা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কথা বলতে সমস্যা নেই। এ বিষয়ে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, গ্রন্থকার তার রিয়ায়ুস সালিহীনের ৩৩৪ তম পাঠে কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন, যার প্রতিটিই প্রসিদ্ধ। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে কয়েকটি হাদীসের মাধ্যমে অল্প কিছু বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে এবং অধিকাংশই ইশারা-ইঙ্গিতে বোঝানো হয়েছে।

৯৬. আবু বারজাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا

‘রাসূল (ﷺ) ইশার আগে নিদ্রা ও পরে কথা বলা অপছন্দ করতেন।’<sup>২২৬</sup>

তেমনিভাবে প্রয়োজনে ইশার পর কথা বলার স্বপক্ষেও অনেক হাদীস রয়েছে।

২২৬. বুখারী: ৫৬৮; সহীহ মুসলিম: ৬৪৭

৯৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (رضي الله عنه) বলেন,

"صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، صَلَاةَ الْعِشَاءِ، فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ"

‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর জীবনের শেষদিকে একবার আমাদের সাথে ইশার নামাজ পড়লেন। অতঃপর সালাম ফিরিয়ে বললেন, তোমরা তোমাদের আজকের এই রাতটিকে দেখেছ? বর্তমানে যারা পৃথিবীর বুকে জীবিত আছে এই রাত থেকে এক শ বছরের মাথায় কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।<sup>২২৭</sup>

৯৮. আবু মুসা আশআরী (رضي الله عنه) (একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে) বলেন,

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى ابْهَارَ اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: عَلَى رَسُولِكُمْ أَعْلَمُكُمْ، أَبْشِرُوا، إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ، أَوْ قَالَ: مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ"

রাসূল (ﷺ) ইশার নামাজে আসতে দেরি করলেন। এমনকি রাত্রি অর্ধেক চলে গেল। এরপর রাসূল (ﷺ) আসলেন এবং তাদের সাথে নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষ হলে উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, কিছু সময় অপেক্ষা করো। আমি তোমাদের কিছু অবহিত করছি—তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, কারণ এটা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত যে, এই মুহূর্তে তোমরা ছাড়া অন্য কোনো মানুষই নামাজ পড়ছে না।

অথবা এভাবে বললেন, এই মুহূর্তে তোমরা ছাড়া অন্য কোনো মানুষই নামাজ পড়ল না।<sup>২২৮</sup>

২২৭. সহীহ বুখারী: ১১৬; সহীহ মুসলিম: ২৫৩৭

২২৮. বুখারী: ৫৬৭; মুসলিম: ৬৪১



৯৯. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,  
 أَنَّهُمْ انْتَبَظُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَهُمْ قَرِينًا مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ،  
 فَصَلَّى بِهِمْ، يَغْنِي الْعِشَاءَ، قَالَ: ثُمَّ خَطَبَنَا، فَقَالَ: "أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا  
 ثُمَّ رَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَبَظْتُمْ الصَّلَاةَ"

এক রাতে লোকেরা রাসূল (ﷺ)-এর অপেক্ষা করতে লাগলেন, অতঃপর  
 তিনি প্রায় অর্ধরাত্রের দিকে আসলেন এবং তাদের সাথে নামাজ অর্থাৎ  
 ইশার নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন,  
 'মানুষজন নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে গেছে। আর তোমরা যে সময় থেকে  
 নামাজের অপেক্ষা করছ সে সময় থেকে নামাজরত আছ।' ২৯৯

১০০. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,  
 بَتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ  
 قَامَ، ثُمَّ قَالَ: نَامَ الْغُلَامُ

এক রাতে আমি আমার খালা রাসূল (ﷺ) এর স্ত্রী মায়মূনা বিন্ত হারিস  
 (رضي الله عنه) এর ঘরে ছিলাম। নবী (ﷺ) সে (পালার) রাতে সেখানে ছিলেন।  
 রাসূল (ﷺ) 'ইশার সালাত আদায় করে তাঁর ঘরে চলে আসলেন এবং  
 চার রাক'আত সালাত আদায় করে শুয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর উঠে  
 বললেন, বালকটি ঘুমিয়ে পড়েছে?' ৩০০

এ ছাড়াও 'সহীহাইনের' মধ্যে আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (رضي الله عنه)-এর  
 মেহমান-বিষয়ক বর্ণনা রয়েছে, তিনি তার মেহমানদের সাথে আবু বকর  
 (رضي الله عنه)-এর অপেক্ষায় ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি ইশার নামাজ পড়ে  
 আসলেন। মেহমানদের সাথে এবং তার স্ত্রী ও পুত্রের সাথে কথা  
 বললেন। এবং তাদের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। ৩০১

২৯৯. সহীহ বুখারী: ৫৭২; মুসলিম: ৬৪০

৩০০. বুখারী: ১১৭; মুসলিম: ৭৬৩

৩০১. বুখারী: ৬০২; মুসলিম: ২০৫৭

এ ধরনের অসংখ্য নজির রয়েছে, যা গণনা করা সম্ভব নয়। এখানে যে পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে বোঝার জন্য তা-ই যথেষ্ট। ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

## ইশাকে ‘عَمَّةٌ’ ‘আ’তামাহ’ অর্থাৎ ‘অন্ধকার’ বা মাগরিবকে ইশা বলা মাকরুহ

প্রসিদ্ধ ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী ইশার সময়কে ‘عَمَّةٌ’ অর্থাৎ ‘অন্ধকার’ বলা মাকরুহ। অনুরূপভাবে মাগরিবের সময়কে ইশা বলাও মাকরুহ।

১০১. আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল মুযানী (رضي الله عنه) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,  
" لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبِ "

‘বেদুইনগণ মাগরিবের নামাজের নামের ব্যাপারে যেন তোমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার না করে।’ আব্দুল্লাহ মুযানী (رضي الله عنه) বলেন, ‘বেদুইনরা মাগরিবের নামাজকে ইশা বলে থাকে।’<sup>২০২</sup>

কোনো কোনো হাদীসে অবশ্য ইশার নামাজকে ‘আতামাহ’ও বলা হয়েছে। যেমন, সহীহাইনের বর্ণনায় রয়েছে :

" لَوْ يَنْفَلِمُونَ مَا فِي الْعَمَّةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا "

তারা যদি জানত, আতামাহ (ইশা) ও ভোরের (ফজর) নামাজে কী মর্যাদা রয়েছে, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও নামাজে উপস্থিত হতো।<sup>২০৩</sup>

এর দুটি কারণ হতে পারে।

এক. হাদীসে এই শব্দ ব্যবহার হয়েছে জায়েজ হিসাবে। এ থেকে বোঝা যে, ইশাকে আতামাহ বলা হারাম নয়, মাকরুহে তানজিহি।

দুই. হাদীসে ‘আতামাহ’ শব্দ দ্বারা ওই সকল লোক উদ্দেশ্য, যাদের ব্যাপারে এই সন্দেহ রয়েছে যে, ইশা শব্দ ব্যবহার করলে তারা ইশা ও মাগরিব নিয়ে দ্বন্দ্ব পড়ে যাবে।

২০২. সহীহ বুখারী: ৫৬৩; সহীহ মুসলিম: ৬৪৪

২০৩. বুখারী: ৬৫৭; মুসলিম: ৪৩৭



তবে ফজরের নামাজকে 'صلاة الغداة' 'সলাতুল গদাহ' অর্থাৎ 'ভোরের নামাজ' বলে ডাকা সহীহ মতানুসারে মাকরুহ নয়। এই শব্দের ব্যবহার অনেক সহীহ হাদীসে রয়েছে। শাফেয়ী মাজহাবের একদল আলেম অবশ্য একেও মাকরুহ বলেছেন; তবে তা অর্থহীন।

এমনিভাবে ইশা ও মাগরিবকে একসাথে 'ইশাআইন' অর্থাৎ 'দুই অঙ্ককারের নামাজ' বলে ডাকতে কোনো সমস্যা নেই। অনুরূপভাবে ইশার নামাজকে 'ইশাউল আখির' বলতেও কোনো বাধা নেই। তবে ইমাম আসমাঈ (ؓ) এরূপ বলতে বারণ করেছেন, যা স্পষ্টতই ভুল।

১০২. আবু হুরাইরা (ؓ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,  
"أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بِخُورٍ فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ"

'যে মহিলা সুগন্ধী ব্যবহার করেছে, সে আমাদের সাথে 'ইশাউল আখির'-এ উপস্থিত হবে না।' ২৩৪

অনুরূপভাবে সহীহাইনের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের এক বিশাল জামাত হতে এই শব্দের ব্যবহার প্রমাণিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রন্থকার বলেন, 'আমি সাক্ষ্য-প্রমাণ সহকারে এর সবিস্তার ব্যাখ্যা আমার তাহযীবুল আসমাই ওয়াল লুগাত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি। ওয়া বিল্লাহিত-তাওফিক।

### কারও গোপন কথা ফাঁস করা নিষেধ

কারও গোপন কিছু ফাঁস করে দেওয়া নিষেধ। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে। আর এতে কোনো ক্ষতি বা কষ্টের আশঙ্কা থাকলে স্পষ্টরূপে হারাম।

১০৩. জাবির (ؓ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,  
"إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ انْتَفَتْ فِيهِ أَمَانَةٌ"

'যখন কেউ কোনো কথা বলে এদিক-ওদিক তাকায়, তবে তা (তার কথা শ্রোতার নিকট) আমানতস্বরূপ।' ২৩৫

২৩৪. সহীহ মুসলিম: ৪৪৪; সুনানে আবু দাউদ: ৪১৭৫; সুনানে নাসায়ী: ৮/১৫৪

২৩৫. আবু দাউদ: ৪৮৬৮; তিরমিযী: ১৯৯৫

কারও নিকট তার স্ত্রীকে প্রহার করার কারণ জানতে চাওয়া নিষেধ  
বিনা প্রয়োজনে কারও নিকট তার স্ত্রীকে প্রহারের কারণ জানতে চাওয়া  
মাকরুহ।

‘জবানের হেফাজত’ অধ্যায়ের শুরুতেই সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে এ  
কথা আলোচনা করা হয়েছে যে, যে কথায় কল্যাণকর কিছু নেই। তা না  
বলে বরং চুপ থাকাই শ্রেয়।

১০৪. আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ)  
বলেছেন,

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ

‘কোনো ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো অনর্থক বিষয় (কথা ও  
কাজ) ত্যাগ করা।’<sup>২০৬</sup>

১০৫. উমর ইবনুল খাত্তাব (رضي الله عنه) রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি  
বলেছেন,

"لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتُهُ"

‘কাউকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা হবে না যে, সে তার স্ত্রীকে কেন  
মেরেছে।’<sup>২০৭</sup>

## কাব্যচর্চা

কাব্যচর্চার ব্যাপারে মুসনাদে আবী ইয়ালাতে সহীহ সনদে হাদীস রয়েছে।

১০৬. আয়িশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ)-এর নিকট কবিতার  
ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

"هُوَ كَلَامٌ. فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ"

‘তা এমন কথা, যার উত্তমটুকু উত্তম আর খারাপটুকু খারাপ।’<sup>২০৮</sup>

২০৬. তিরমিযী: ২৩১৭

২০৭. আবু দাউদ: ২১৪৭; ইবনে মাজাহ: ১৯৮৬। হাদীসটির একজন রাবী দাউদ বিন আব্দুল্লাহকে ইবনুল হাজার  
আসকালানী (رحمته الله) মাকবুল ফিল মুতাবআত বলেছেন। তবে হাদীসটি দুর্বল।

২০৮. মুসনাদে আবু ইয়াল: ৪৭৬০; সুনানুল কুবরা লি বাইহাকী: ১০/২৩৯; সুনানে দারাকুতনী: ৪/১৫৫;  
মাজমুআতুজ যাওয়াইদ: ৮/১২২; সিলসিলাতুস সহীহাহ: ৪৪৮।



উলামায়ে কেরাম বলেন, এ কথার অর্থ কবিতা বা পদ্য গদ্যের মতোই। তবে তার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কবিতা নিয়েই পড়ে থাকা নিন্দনীয়।

অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়, রাসূল (ﷺ) কবিতা শুনেছেন এবং হাসান বিন ছাবিত (رضي الله عنه)-কে কাফিরদের নিয়ে ব্যঙ্গ-কবিতা লেখার অনুমতি দিয়েছেন।

এ ছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে কবিতা সম্পর্কে রাসূল (ﷺ)-এর মন্তব্য পাওয়া যায়।

যেমন :

১০৭. উবাই বিন কাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً

‘নিশ্চয়ই কিছু কবিতা তাৎপর্যপূর্ণ।’<sup>২৩৯</sup>

১০৮. আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

لَا تَمْتَلِئْ جَوْفُ رَجُلٍ قَبِيحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا

তোমাদের কারও উদর কবিতা দ্বারা পূর্ণ হওয়ার চেয়ে পুঁজ দ্বারা পূর্ণ হওয়া উত্তম।<sup>২৪০</sup>

শেষোক্ত বর্ণনা দুটি দ্বারা কবিতা সম্পর্কে রাসূল (ﷺ)-এর প্রথম বাণীটিই যথার্থরূপে প্রমাণিত হয়।

## অশ্লীল ও নোংরা কথা বলা নিষেধ

অশ্লীল ও নোংরা কথা বলাও শরীয়তের নিষেধাবলির অন্যতম একটি। এ ব্যাপারে অসংখ্য সহীহ হাদীস রয়েছে। যেগুলো প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত।

অশ্লীল ও নোংরা কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঘটনা সত্য এবং বক্তা তার কথায় সত্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও এ ধরনের অশ্লীল ও নোংরা কথা

২৩৯. বুখারী: ৬১৪৫; আবু দাউদ: ৫০১০

২৪০. বুখারী: ৬১৫৫

কোনোরূপ রাখটাক ছাড়াই স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা। এগুলো নিষেধ। ঘটনা বর্ণনা বা অবস্থা পর্যালোচনা করতে গিয়ে সাধারণত এ ধরনের কথাবার্তা বলা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে ইশারা-ইঙ্গিতে, সুন্দর কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে এমনভাবে কথা বলা উচিত। যাতে উদ্দেশ্য সহজেই বোধগম্য হয়। কুরআন ও সুন্নাহর নীতি এটাই।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

‘أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ’

‘রোজার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রীগণের নিকট আক্ৰহীন হওয়া হালাল করা হয়েছে।’<sup>২৪১</sup>

তিনি আরও বলেন :

‘وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا’

‘তোমরা কীরূপে তা গ্রহণ করতে পারো, অথচ তোমরা একজন অন্যজনের কাছে গমন এবং নারীরা তোমাদের কাছ থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।’<sup>২৪২</sup>

আরও বলেন :

‘وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ’

‘আর যদি মোহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তোমরা তাদের তালাক দিয়ে দাও।’<sup>২৪৩</sup>

এ ছাড়াও কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও সহীহ হাদীস এ ধরনের ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে।

উলামায়ে কেরাম বলেন, ‘যে সকল ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাষায় কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা কাজের নাম-পরিচয় উল্লেখ করা লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তবে তা

২৪১. সূরা বাকারা, ২ : ১৮৭, ‘رَفَثٌ’ ‘রফাহ’ শব্দের শাব্দিক অর্থ আক্ৰহীন হওয়া, অশ্লীল কিছু, আয়াতের উদ্দেশ্য ‘সহবাস’। বর্তমান তরজমা ও ব্যাখ্যায় সহজের জন্য উদ্দেশ্যই অনুদিত হয়েছে। (অনুবাদক)

২৪২. সূরা নিসা, ৪ : ২১

২৪৩. সূরা বাকারা, ২ : ২৩৭



না করে বরং ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে মূলভাব প্রকাশ করা উচিত। এ কারণেই দ্বীরা সাথে ‘جَمَاعٌ’ ‘জিমা’ তথা ‘সহবাস’কে ‘إِفَاضَةٌ’ ‘ইফাযাহ’ ‘মিলন’, ‘دُخُولٌ’ ‘দুখুল’ ‘প্রবেশ করা’, ‘مُتَاشِرَةٌ’ ‘মু’আশারাহ’ ‘মেলামেশা’ বা ‘وِقَاعٌ’ ‘ওয়িকাউন’ ‘সংগম’ ইত্যাদি ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দে প্রকাশ করা উচিত। এর বিপরীতে ‘نَيْتٌ’ ‘যৌনক্রিয়া’ বা ‘جَمَاعٌ’ ‘সহবাস’ ইত্যাদি স্পষ্ট শব্দে উল্লেখ না করা।

অনুরূপভাবে মল-মূত্র ত্যাগকে ‘فَضَاءُ الْحَاجَةِ’ ‘কাযাউল হাজাতি’ ‘প্রয়োজন সারা’, ‘জরুরত সারা’ বা ‘نَيْتُ الْخَالَةِ’ ‘বাইতুল খালাহ’ ‘প্রক্ষালন কক্ষে’ বা ‘শৌচালয়ে’ যাওয়া ইত্যাদি বলা যেতে পারে। (আমরা যেমন শৌচাগারে যাওয়া, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া, কিংবা প্রাকৃতিক কাজ সারা ইত্যাদি বলতে পারি)। এর বিপরীতে স্পষ্ট ভাষায় মল-মূত্র বা পেশাব-পায়খানা বলা শোভনীয় নয়।

এমনিভাবে বিভিন্ন দোষের আলোচনাতেও ‘بَرَصٌ’ ‘বারাস’ ‘কুষ্ঠ’, ‘بَخْرٌ’ ‘বাখার’ ‘মুখে দুর্গন্ধ’ ও ‘صَنَّانٌ’ ‘ছুনানুন’ ‘বগলতলে বা ঘামের দুর্গন্ধ’ ইত্যাদি লজ্জাজনক অপারগতাকে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ না করে এমন সুন্দর কোনো ব্যাখ্যা বা ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় উল্লেখ করা, যাতে মূল বিষয় সহজেই বুঝে আসে। এ ছাড়াও এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে, যা আমাদের আলোচনার সাথে মিলে যায়।

তবে জানা থাকা দরকার, ওপরে বর্ণিত রূপক ও ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যাখ্যা তখনই করা যাবে যখন অশ্লীল ও নোংরা কথা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করার প্রয়োজন দেখা দেবে না। কিন্তু বক্তব্যের দ্বারা যদি ঘটনার বিবরণ প্রদান বা শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য হয়, আর শ্রোতা কিংবা পাঠকের সে ইঙ্গিতপূর্ণ কথা না বোঝার আশঙ্কা থাকে এবং ভুল বোঝার সম্ভাবনা দেখা দেয়, এমতাবস্থায় সঠিক শব্দে স্পষ্ট ভাষায় বলাই উত্তম। যাতে করে সঠিক বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম হয়। যে সকল হাদীসে এ ধরনের স্পষ্ট শব্দ ও বর্ণনা এসেছে, তা ওপরোল্লিখিত বর্ণনার ভিত্তিতেই এসেছে। কেননা, এ ধরনের

আলোচনায় মূল উদ্দেশ্য বুঝতে পারা আদব ও ভব্যতা রক্ষার চেয়ে বেশি গুরুত্বের দাবিদার।

১০৯. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ"

‘মুমিন কখনো নিন্দুক, অভিসম্পাতকারী, অশ্লীল ও কটুভাষী হতে পারে না।’<sup>২৪৪</sup>

ইমাম তিরমিযী (رحمته الله) বলেন, ‘হাদীসটি হাসান।’

১১০. আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ

‘যেকোনো বিষয়ে অশ্লীলতা তার কদর্যতা বাড়িয়ে দেয় আর লজ্জা যেকোনো বিষয়ের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়।’<sup>২৪৫</sup>

ইমাম তিরমিযী (رحمته الله) বলেন, ‘হাদীসটি হাসান।’

### পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার

পিতা-মাতা ও তাদের সমতুল্য মানুষকে ধমক দেওয়া বা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা কঠোরভাবে হারাম।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝

‘তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত কোরো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের মধ্যে কেউ

২৪৪. সুনানে তিরমিযী: ১৯৭৭

২৪৫. সুনানে তিরমিযী: ১৯৭৪; ইবনে মাজাহ: ৪১৫৮



অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদশায় বার্ষিক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের 'উহ' শব্দটিও বোলো না এবং তাদের ধমক দিয়ো না এবং তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বোলো। এবং তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে, নম্রভাবে, মাথা নত করে দাও। এবং বোলো, হে পালনকর্তা, তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।<sup>২৪৬</sup>

১১১. আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"مِنَ الْكِبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ"

‘কোনো ব্যক্তির জন্য তার পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, কেউ কি তার পিতা-মাতাকে গালি দিতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে কারও পিতাকে গালি দেয় আর উক্ত ব্যক্তিও তার পিতাকে গালি দেয়। অনুরূপভাবে সে কারও মাতাকে গালি দেয় আর উক্ত ব্যক্তিও তার মাতাকে গালি দেয়।’<sup>২৪৭</sup>

১১২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (رضي الله عنه) বলেন,

كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةً وَكُنْتُ أَحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِي طَلِّقْهَا، فَأَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلِّقْهَا

আমার এক স্ত্রী ছিল, যাকে আমি খুব ভালোবাসতাম। কিন্তু (আমার পিতা) উমর (رضي الله عنه) তাকে অপছন্দ করতেন। তিনি আমাকে বললেন, ‘তাকে তালাক দিয়ে দাও।’ আমি অস্বীকৃতি জানালাম। তখন উমর (رضي الله عنه) রাসূল

২৪৬. সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ২৩-২৪

২৪৭. সহীহ বুখারী : ৫৯৭৩; সহীহ মুসলিম : ৯০

(ﷺ)-এর নিকট এসে বিষয়টি তুললেন। সব শুনে রাসূল (ﷺ) বললেন, 'তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও।' <sup>২৪৮</sup>

ইমাম তিরমিযী (رحمہ اللہ) বলেন, 'হাদীসটি হাসান সহীহ।'

## মিথ্যার প্রকারভেদ এবং এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা

কুরআন এবং হাদীসের অকাট্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে সকল প্রকার মিথ্যা স্পষ্টরূপে হারাম বলে প্রমাণিত। এটি জঘন্যতম গুনাহ এবং নিকৃষ্টতম বদ অভ্যাস। মিথ্যা হারাম হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট অকাট্য প্রমাণাদিসহ উম্মতের সর্বসম্মত ঐকমত্য রয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মতামত তুলে ধরার কোনো প্রয়োজন নেই।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এমন-সব মিথ্যা তুলে ধরা, যা হারাম নয়। পাশাপাশি এর (হারাম না হওয়ার) যথার্থতা সম্পর্কে অবহিত করা।

মিথ্যাকে ঘৃণা করার জন্য নিম্নে বর্ণিত একটি হাদীসই যথেষ্ট, যার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সকলে একমত।

১১৩. আবু হুরাইরা (رضی اللہ عنہ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

" آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ "

'মুনাফিকের আলামত হলো তিনটি—যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে এবং আমানত রাখলে খিয়ানত করে।' <sup>২৪৯</sup>

১১৪. আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (رضی اللہ عنہ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

" أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ "

২৪৮. সুনানে আবু দাউদ: ৫১৩৮; তিরমিযী: ১১৮৯

২৪৯. বুখারী: ৩৩; মুসলিম: ৫৯



‘চারটি জিনিস (স্বভাব) যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এগুলোর একটি রয়েছে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব রয়ে যায়। (স্বভাবগুলো হলো) আমানত রাখলে খিয়ানত করে, কথা বললে মিথ্যা বলে, চুক্তি করলে ভঙ্গ করে এবং বিবাদে জড়ালে অশ্লীল কথা বলে।’<sup>২৫০</sup>

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় ‘إِذَا أَوْثُمِنَ خَانَ’ ‘আমানত রাখলে খিয়ানত করে’ এর বদলে ‘إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ’ ‘প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে’ রয়েছে।

### এমন মিথ্যা, যা হারামের বিধান হতে মুক্ত

১১৫. উম্মে কুলসুম (رضي الله عنها) বলেন, তিনি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

“لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا”

‘যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে সন্ধির উদ্দেশ্যে একের কথা অন্যকে বলে বা ভালো কথা বলে সে মিথ্যাবাদী নয়।’<sup>২৫১</sup>

সহীহইনে হাদীসের বর্ণনার পরিমাণ এতটুকুই। তবে মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় নিম্নোক্ত বাড়তি বর্ণনা রয়েছে : বর্ণনাকারী ইবনু শিহাব (رضي الله عنه) বলেন,

“وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا”

‘আমি তিন জায়গা ব্যতীত (অন্য কোথাও কাউকে) এমন মিথ্যা বলার অবকাশ দিতে দেখিনি, যা মানুষ বলে থাকে অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে, দুজনের মাঝে সন্ধি স্থাপনে এবং স্ত্রীর নিকট স্বামী কিংবা স্বামীর নিকট স্ত্রীর মিথ্যা বলা।’

<sup>২৫০</sup>. সহীহ বুখারী: ৩৪; সহীহ মুসলিম: ৫৮

<sup>২৫১</sup>. সহীহ বুখারী: ২৬৯২; সহীহ মুসলিম: ২৬০৫। এই উম্মে কুলসুম (رضي الله عنها) নবী-তনয়া নন। তিনি উম্মে কুলসুম বিনতে ওকবা ইবনে আবু মুঈত্ত। তিনি প্রথম সারির মুহাজিরগণের একজন। (অনুবাদক)

অতএব কল্যাণের স্বার্থে কিছু কিছু মিথ্যা জায়েজ হওয়ার স্বপক্ষে এই হাদীসটি স্পষ্ট প্রমাণ। আর উলামায়ে কেরাম সকল জায়েজ ও বৈধ মিথ্যাকে বিন্যস্ত করেছেন।

গ্রন্থকার বলেন, তন্মধ্যে আমার নিকট ইমাম গাজালী (رحمہ اللہ)-এর বিন্যাসকে সর্বাপেক্ষা শ্রেয় মনে হয়েছে, যা তিনি তার ইহইয়াউ উলুমুদ দ্বীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ‘কথা হলো অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার মাধ্যম। আর উত্তম লক্ষ্যে সত্য এবং মিথ্যা উভয়ের সাহায্যে পৌঁছানো সম্ভব। অতএব বিনা প্রয়োজনে মিথ্যা বলা হারাম। আর যদি কোনো লক্ষ্যে কেবল মিথ্যার আশ্রয় নিয়েই পৌঁছানো সম্ভব হয়। সত্যের মাধ্যমে সম্ভব না হয়। তবে অভীষ্ট লক্ষ্য যদি জায়েজ হয়, তবে তাতে মিথ্যা বলা জায়েজ। আর লক্ষ্যে পৌঁছানো যদি ওয়াজিব হয়, তবে তার জন্য মিথ্যা বলা ওয়াজিব।’<sup>২৫২</sup>

যদি কোনো মুসলমান কোনো অত্যাচারী হতে আত্মগোপন করে থাকে আর তার ব্যাপারে সে জানতে চায়, তাহলে তার আত্মগোপনের ব্যাপারে মিথ্যা বলা ওয়াজিব।

তেমনিভাবে কারও নিজের বা তার জানামতে অন্যের জিম্মায় কোনো গচ্ছিত আমানত থেকে থাকে আর কোনো অত্যাচারী তা কেড়ে নেওয়ার ইচ্ছায় সে সম্পর্কে জানতে চায়, তবে এ খবর গোপন রাখার জন্য মিথ্যা বলা ওয়াজিব। আর যদি সে তার নিকট গচ্ছিত আমানত সম্পর্কে উক্ত জালিমকে অবহিত করে আর সে তা বলপূর্বক নিয়ে নেয়, তবে আমানতদারের ওপর দণ্ড ও জরিমানা ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

আর যদি তাকে শপথ করতে বলা হয়, তবে তার কর্তব্য—শপথের মধ্যে দ্ব্যর্থবোধক কথা বলা। অর্থাৎ এমনভাবে কসম করবে যে কসমও হবে আবার সত্যও প্রকাশ পাবে না।



আর যদি সে তার শপথের মধ্যে ‘তাওরিয়া’ অর্থাৎ দ্ব্যর্থবোধক কথার আশ্রয় না নিয়ে মিথ্যা কসম খেয়ে বসে, তবে তার এই কাজ প্রশংসার দাবি রাখলেও সে কসম ভঙ্গকারী বলে বিবেচিত হবে। আর এটাই সঠিক মত। এ ক্ষেত্রে তাকে কসম ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে। কেউ কেউ অবশ্য কসম ভঙ্গ হবে না বলে মত দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে, দুই ব্যক্তির মধ্যে সন্ধি স্থাপনে এবং অপরাধের ক্ষমা লাভের জন্য অন্যায়ের শিকার ব্যক্তির মন গলানো যদি উদ্দেশ্য হয়। আর তা একমাত্র মিথ্যা দ্বারাই সম্ভব, তবে সে ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা হারাম নয়।

তবে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, ওপরে যেসব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তা কেবল তখনই বলা যাবে যখন মিথ্যার আশ্রয় ছাড়া কোনো সৎ উদ্দেশ্য লাভ করা অসম্ভব হয়। আর সতর্কতামূলক এসব ক্ষেত্রেও ‘তাওরিয়া’-এর আশ্রয় নেওয়া উচিত। আর তাওরিয়ার অর্থ হলো নিজের শব্দের ব্যবহারে এমন সঠিক উদ্দেশ্যের নিয়ত করা, যা তার ধারণা অনুযায়ী মিথ্যা নয়। যদিও বাহ্যত তা মিথ্যা মনে হয়।

আর যদি কেউ তার দ্ব্যর্থবোধক কথায় সঠিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ না করে; বরং স্পষ্ট মিথ্যাই বলে দেয়। তবে এমতাবস্থায় (জায়েজ ক্ষেত্রে) তা মিথ্যা নয়।

ইমাম গাজালী (رحمہ اللہ) বলেন, ‘কারও নিজের বা অন্যের সাথে সম্পৃক্ত কোনো সঠিক বিষয়ে কল্যাণের স্বার্থে মিথ্যা বলা জায়েজ। ব্যক্তির নিজের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ের উদাহরণ হিসাবে এ কথা বলা যায় যে, কোনো অত্যাচারী যদি তাকে আটক করে তার সম্পদ গ্রাস করার হীন লক্ষ্যে তার কাছে সম্পদের খোঁজ জানতে চায়, তবে তার জন্য সম্পদের বিষয়টি অস্বীকার করা জায়েজ আছে। অনুরূপভাবে কোনো শাসক বা বিচারক

যদি তার কাছে এমন কোনো অপকর্মের বিষয়ে জানতে চায়, যার সম্পর্ক তার সাথে এবং আল্লাহর সাথে, তবে তার জন্য উল্লেখিত বিষয়টি অস্বীকার করা জায়েজ আছে। যেমন : আমি ব্যভিচার করিনি বা মদ্যপান করিনি বলা।’

নিজের অন্যায় অপকর্মের স্বীকারোক্তিকে প্রত্যাহারে প্ররোচিত করার ব্যাপারে কিছু প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত হাদীস রয়েছে। যেখানে দণ্ডনীয় অপরাধের স্বীকারোক্তি প্রদানের পরেও রাসূল (ﷺ) তা প্রত্যাহারে প্ররোচিত করেছেন।

আর অন্যের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ের উদাহরণ হলো, কারও নিকট তার কোনো ভাইয়ের গোপন বিষয় জানতে চাওয়া হলে সে তা অস্বীকার করবে। এমন আরও উদাহরণ রয়েছে।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে সকলের জন্য মিথ্যার খারাপ দিক এবং সত্যপ্রকাশে পরিস্থিতির অবনতি সম্পর্কে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা উচিত। যদি সত্য বলার দ্বারা অধিকতর সমস্যা দেখা দেবে মনে হয়, তবে এমতাবস্থায় মিথ্যা বলাই বাঞ্ছনীয়। এর বিপরীতে সত্য বলার দ্বারা যদি কোনো সমস্যা না হয় কিংবা সত্য-মিথ্যার পরিণতি সম্পর্কে দ্বিধা থাকে, তবে সত্যই বলতে হবে। মিথ্যা বলা হারাম হবে। আর নিজের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ে মিথ্যা বলা জায়েজ হলেও না বলাই মুস্তাহাব। তবে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ে মিথ্যা বলা জায়েজ হলে তাতে দখল দেওয়া জায়েজ হবে না। অর্থাৎ মিথ্যা বলাই উত্তম হবে।

তবে জায়েজ ক্ষেত্রে বুদ্ধির মারপ্যাঁচ পরিত্যাগ করে সত্য বলাই উত্তম। কিন্তু যে ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা ওয়াজিব সে ক্ষেত্রে মিথ্যাই বলতে হবে।

অবশ্য জ্ঞাতব্য যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, ‘কোনো বিষয়ে তার বাস্তবতার বিপরীত বর্ণনা দেওয়াকে মিথ্যা বলে।’ চাই তা ইচ্ছাকৃত হোক বা অজ্ঞতাবশত। তবে ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশত মিথ্যা বললে



গুনাহগার হবে না। পক্ষান্তরে ইচ্ছাকৃত বললে নিশ্চিত গুনাহগার হবে।  
এর প্রমাণ হলো রাসূল (ﷺ)-এর বাণী :

رَبِّكَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

‘যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার নামে মিথ্যা বলল, সে যেন জাহান্নামকে তার  
ঠিকানা বানিয়ে নিল।’<sup>২৫৩</sup>

যে যা বলে তা-ই সঠিক মনে করা এবং সঠিক ধারণা ছাড়া  
শোনা কথা বলে বেড়ানো নিষেধ

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا  
‘যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পেছনে পোড়ো না। নিশ্চয়ই কান,  
চক্ষু ও অন্তঃকরণ সবই জিজ্ঞাসিত হবে।’<sup>২৫৪</sup>

তিনি আরও বলেন :

مَا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

‘সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা-ই গ্রহণ করার জন্য তার কাছে রয়েছে  
সদা প্রস্তুত প্রহরী।’<sup>২৫৫</sup>

আরও বলেন :

إِنَّ رَبَّكَ لَبَالِغُ صَادٍ

‘নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।’<sup>২৫৬</sup>

১১৬. আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ"

‘মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তা-ই  
বলে।’<sup>২৫৭</sup>

২৫৩. সহীহ বুখারী: ১২৯১; সহীহ মুসলিম: ৩। হাদীসটি কমপক্ষে ৬০ জন সাহাবী হতে বর্ণিত।

২৫৪. সূরা বনি ইসরাঈল, ১৭ : ৩৬

২৫৫. সূরা কাফ, ৫০ : ১৮

২৫৬. সূরা ফাজর, ৮৯ : ১৪

২৫৭. সহীহ বুখারী: ১২৯১; সহীহ মুসলিম (মুকাদ্দামা) : ৩

ইমাম মুসলিম (رحمه الله) এই হাদীসটি দুটি সনদে (সূত্রে) বর্ণনা করেছেন।

তন্মধ্যে প্রথম হলো উপর্যুক্ত বর্ণনাটি যা ‘মুত্তাসিল’ অর্থাৎ সাহাবী স্বয়ং রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। আর দ্বিতীয়টি ‘মুরসাল’ অর্থাৎ সেই সনদে তাবেয়ী হাফস ইবনে আসেম (رحمه الله) সাহাবী আবু হুরাইরা (رضي الله عنه)-এর নাম উল্লেখ করেননি।

এতদুভয়ের মধ্যে আবু হুরাইরা (رضي الله عنه)-এর নাম উল্লেখ থাকা ‘মুত্তাসিল’ সনদটি অগ্রগণ্য। কেননা, তা অধিকতর বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। আর এটাই ফিকাহ, মূলনীতি ও হাদীসশাস্ত্রের ইমামগণের মত। যখন কোনো হাদীস ‘মুত্তাসিল’ ও ‘মুরসাল’ দুই সনদেই বর্ণিত হবে, তখন ‘মুত্তাসিল’ সনদটি অগ্রগণ্য হবে, একে সহীহ বলে রায় দেওয়া হবে এবং এই হাদীসকে দ্বীনের বিধি-বিধানসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এ ছাড়াও সহীহ মুসলিমে উমর ইবনুল খাত্তাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে যে,

‘يَحْسَبُ الْمَرْءُ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ’

‘মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে, তা-ই বলে বেড়ায়।’<sup>২৫৮</sup>

সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (رضي الله عنه) হতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। আর এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ হতে আরও অনেক বর্ণনা রয়েছে।

১১৭. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (رضي الله عنه) অথবা হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

“بُشِّرَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعْمُوهَا”

‘মানুষের নিকৃষ্টতম বাহন হলো যা সে ধারণা করে।’<sup>২৫৯</sup>

২৫৮. সহীহ মুসলিম: ৫। হাদীসটি উমর (رضي الله عنه)-এর ওপর মাওকুফ হলেও মারফু হাদীসের অর্থ বহন করে।

২৫৯. সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৭২; মুসনাদে আহমদ: ৫/৪০১



এই হাদীস সম্পর্কে ইমাম আবু সুলাইমান আল খাত্তাবী (رحمہ اللہ) তার মাআলিমুস সুনান গ্রন্থে বলেন, 'এই হাদীসের মূল হলো, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো প্রয়োজনে কোনো স্থান বা শহরে যাওয়ার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তার বাহনে চড়েন এবং চলতে চলতে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যান। রাসূল (ﷺ) মানুষের ধারণামূলক কথাকে উপর্যুক্ত বর্ণনার সাথে তুলনা দেওয়ার কারণ হলো মানুষ তার কথার আগে-পিছে প্রয়োজন অনুপাতে নিজ থেকে কিছু জুড়ে দেয়। আর নিজ ধারণা থেকে কিছু কথা জুড়ে দেওয়াটা নিকৃষ্ট বাহন বেছে নেওয়ার মতো। মানুষের ধারণাকে বাহনের সাথে তুলনা দেওয়ার আরও একটি কারণ হলো, মানুষ যখন ধারণা করে কথা বলে তখন তা সাধারণত কোনোরকম সূত্র ও যাচাই-বাছাই ছাড়াই বলা হয়; বরং শুধু বলার জন্যই বলা হয়।

মোটকথা হলো, রাসূল (ﷺ) এভাবে ধারণাভিত্তিক কথা বলাকে নিন্দনীয় বলে অভিহিত করেছেন। আর যাচাই করে সঠিক কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব প্রতিটি কথার সঠিক যোগসূত্র প্রমাণিত না হলে তা বলা উচিত নয় (এটাই ইমাম খাত্তাবী (رحمہ اللہ)-এর অভিমত)।' আল্লাহই সর্বজ্ঞ।<sup>২৬০</sup>

### ঘুরিয়ে কথা বলা ও দ্ব্যর্থবোধক কথা

এ বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এর ব্যবহার এবং এর সাথে মানুষের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি। তাই এর সঠিক বিশ্লেষণে অধিক মনোযোগী হওয়া উচিত। আর এ ব্যাপারে সম্যক অবগতি লাভের পর মানুষের উচিত বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ও তদনুযায়ী আমল করা। মিথ্যা বলাকে ঘৃণ্যতম হারাম হিসাবে তুলে ধরার পাশাপাশি কথাবার্তার মধ্যে বিদ্যমান অন্যান্য সমস্যা ও ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে। এই পাঠে সেসব থেকে বেঁচে থাকার উপায় বাতলে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

মনে রাখতে হবে, 'تَغْرِیضُ' 'তারীয' 'ঘুরিয়ে কথা বলা' ও 'تَوْرِیةُ' 'তাওরিয়াহ' 'দ্ব্যর্থবোধক' শব্দদ্বয় দ্বারা কথার মধ্যে এমন শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার উদ্দেশ্য, যার বাহ্যিক অর্থ ও উদ্দেশ্য এক রকম হয়। তবে এর দ্বারা অন্য কোনো অর্থ বা ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য হয়। আর উদ্দিষ্ট অর্থ ও ব্যাখ্যাটি বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত হয়। যার তুলনা ধোঁকা বা প্রতারণার সাথে হতে পারে।

উলামায়ে কেরাম বলেন, কারও ধোঁকা দেওয়ার পেছনে গ্রহণযোগ্য শরয়ী ওজর কিংবা এমন কোনো বৈধ প্রয়োজন যদি থাকে, মিথ্যা ছাড়া যা হাসিল করা সম্ভব নয়, তবে সে ক্ষেত্রে ঘুরিয়ে কথা বলায় সমস্যা নেই। আর যদি এমন কিছু না থাকে, তবে তারীয ও তাওরিয়া মাকরুহ হবে, হারাম নয়। কিন্তু এতে যদি শরীয়তবহির্ভূত বিষয়ের সংশ্লিষ্টতা বা সত্যের অপনোদন পাওয়া যায়, তবে তা হারাম। এটাই এই পাঠের মূলকথা।

এতৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। আর তাতে বৈধ ও অবৈধ উভয় মতই রয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পূর্বের আলোচনাতেই তা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

তারীয বা তাওরিয়ার আশ্রয় নিয়ে কথা বলার নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে আবু দাউদ শরীফে একটি বর্ণনা রয়েছে। উক্ত বর্ণনার সনদে দুর্বলতা থাকলেও ইমাম আবু দাউদ একে দুর্বল বলেননি। তার নিকট হাদীসটি হাসান হওয়ার দাবি রাখে।

১১৮. সুফিয়ান বিন আসাদ (رحمہ اللہ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "كَبُرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهٍ مُصَدِّقٌ، وَأَنْتَ لَهُ بِهٍ كَاذِبٌ" 'এ তো অনেক বড় বিশ্বাসঘাতকতা যে, তুমি তোমার ভাইকে এমন কথা বললে, যাতে সে তোমাকে সত্যবাদী মনে করে, অথচ তুমি এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী।' ২৬১

২৬১. সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৭১। হাদীসটির একজন রাবী 'ইবনুল ওয়ালীদ' সম্পর্কে মুহাদিসগণের আপত্তি থাকায় হাদীসটি যঈফ। তবে ইমাম আবু দাউদ (رحمہ اللہ) হাদীসটিকে যঈফ বলেননি।



ইবনে সিরীন (رحمہ اللہ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘কালাম তথা ভাষার ব্যবহার কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার চেয়েও বেশি প্রশস্ত।’ অর্থাৎ কথা বলার এমন অনেক কলাকৌশল রয়েছে যা জানা থাকলে বুদ্ধিমানমাত্রই মিথ্যা থেকে দিবি বেঁচে থাকতে পারে।<sup>২৬২</sup>

ঘুরিয়ে কথা বলার উদাহরণ দিতে গিয়ে ইবরাহীম নাখায়ী (رحمہ اللہ) বলেন, ‘কেউ যদি তোমার বলা কথা সম্পর্ক জেনে যায়, তখন তুমি বলো,

اللَّهُ يَغْلُمُ مَا قُلْتُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ

এর অর্থ দু-রকম হতে পারে। যথা :

১. আল্লাহ জানেন, আমি এমন কিছু বলিনি। সে ক্ষেত্রে বাক্যে থাকা ‘لَا’ শব্দটি ‘مَا لِلشَّيْءِ’ না-বোধক অর্থ দেবে।

২. আমি এ বিষয়ে যা কিছু বলেছি তা আল্লাহ জানেন। এমতাবস্থায় ‘لَا’ শব্দটি ‘مَا لِلْمَوْضُوعِ’। যার অর্থ হবে ‘যা বা যা-কিছু’।

এভাবে বললে শ্রোতা প্রথম অর্থ বুঝবে অর্থাৎ সে কিছু বলেনি। আর বক্তা তার মনে দ্বিতীয় অর্থ পোষণ করবে। এতে সত্য গোপন থাকবে আবার মিথ্যাও বলা হবে না (প্রত্যেক ভাষাভাষী মানুষের জন্যই নিজ নিজ ভাষায় এমন সুযোগ রয়েছে)।

ইমাম নাখায়ী (رحمہ اللہ) আরও বলেন, ‘নিজের ছেলেকে এ কথা বলবে না যে, তোমার জন্য মিষ্টান্ন কিনব? বরং এভাবে বলবে, আমি যদি তোমার জন্য মিষ্টান্ন ক্রয় করি, তাহলে কেমন হয়?’

নাখায়ী (رحمہ اللہ)-এর নিকট কেউ কিছু চাইলে তিনি বাঁদির মাধ্যমে তাকে বলে পাঠাতেন, ‘সে যেন এই জিনিস তার কাছে মসজিদে চায়’ (মসজিদে দুনিয়াবি জিনিস চাওয়া নিষেধ। সুতরাং সে চাইতেও পারবে না আর ইমাম সাহেব (رحمہ اللہ)-এর তা দিতেও হবে না)।

২৬২. দারে ইবনে হাজারের নুসখায় *দুররুল মানসূর*: সূরা তওবা ১১৯। ইবনুল আদী ও বাইহাকী (رحمہ اللہ)-এর সূত্রে বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন। তবে আমরা হবহ এ রকম কিছু পাইনি। (অনুবাদক)

অন্য এক ব্যক্তি বলেন, 'ইতিপূর্বে আমার পিতা একবার ঘর থেকে বের হলেন, বের হয়ে তিনি দেখেন ইমাম শাবী (رحمہ اللہ) বৃত্ত আঁকছেন আর বাঁদিকে বলছেন এই বৃত্তের দিকে আঙুল দ্বারা ইশারা করে বলবে 'তিনি এখানে নেই'।

অনুরূপভাবে সচরাচর কাউকে খানার দাওয়াত দেওয়া হলে অনাগ্রহী ব্যক্তি এ কথা বলতে পারে যে 'আমি নিয়ত করেছি'। এতে দাওয়াতদাতা মনে করবে সে রোজার নিয়ত করেছে। আর তার মনে থাকবে না খাওয়ার নিয়ত।

তেমনিভাবে কেউ যদি প্রশ্ন করে 'أَبْصَرْتَ فُلَانًا' অমুককে দেখেছ? প্রত্যুত্তরে অন্যজন বলল, 'مَا أَرَىٰ'। এর দুটি অর্থ হতে পারে।

এক. আমি তাকে দেখিনি।

দুই. 'مَا أَرَىٰ' আমি তার ফুসফুসে আঘাত করিনি। কারণ, 'رُئِيَ' 'রু'তুন' শব্দের অর্থ ফুসফুস। এ ধরনের আরও অনেক উদাহরণ আছে।

এমনিভাবে তাওরিয়া তথা দ্ব্যর্থবোধক কথায় কেউ যদি কসমও খেয়ে বসে। তার কসম ভঙ্গ হবে না। চাই আল্লাহর নামে, তালাকের বা অন্যকিছুর কসম হোক। কসম ভঙ্গ বা তালাক কিছুই হবে না।

তবে বিচারক যদি কাউকে আল্লাহর নামে বা তালাকের শপথ করায়, তবে সে ক্ষেত্রে তাওরিয়ার সুযোগ নেওয়া যাবে না। কেননা, এ ক্ষেত্রে বিচারকের নিয়তই মূল উদ্দেশ্য। তাই বিচারকের এজলাসে তাওরিয়ার আশ্রয় নিয়ে শপথ করলে তা ভঙ্গ হবে। কিন্তু বিচারক তালাকের শপথ নিলে তাওরিয়া করলেও তালাক হবে না। এ ক্ষেত্রে শপথকারীর নিয়তই মুখ্য। কেননা, বিচারকের জন্য তালাকের শপথ নেওয়া জায়েজ নেই। এ ক্ষেত্রে বিচারকও সাধারণ মানুষের মতোই।

ইমাম গাজালী (رحمہ اللہ) বলেন, 'নিশ্চিতরূপে গুনাহ হওয়ার মতো একটি হারাম মিথ্যা, যা সচরাচর মানুষ করে থাকে তা হলো 'বাড়িয়ে বলা'।



যেমন কেউ বলল ‘আমি তোমাকে শতবার বলেছি’ বা ‘তোমার কাছে শতবার চেয়েছি’ ইত্যাদি। এ ধরনের কথা দ্বারা সাধারণত সংখ্যা উদ্দেশ্য হয় না; বরং ‘অনেকবার’ বোঝানো উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে যদি একবারের বেশি না চায় বা না বলে, তবে মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে। আর যদি অনেকবার করে থাকে, যার গণনা নেই তবে এ ধরনের কথায় গুনাহ হবে না। যদিও তা শতবার না হয়। তবে এর কিছু শ্রেণিবিভাগ রয়েছে, যার অধিকাংশই মিথ্যা বলে অভিযুক্ত হয়।<sup>২৬৩</sup>

ইমাম নববী (رحمہ) বলেন, ‘প্রচলনের ক্ষেত্রে মুবালাগা অর্থাৎ বাড়িয়ে বলা জায়েজ এবং এতে কেউ মিথ্যাবাদী হয় না। এর প্রমাণ সহীহাইনে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে। রাসূল (ﷺ) বলেন,

أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُغْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ

আবু জাহাম তো নিজের কাঁধ হতে লাঠি নামায়ই না, তবে মুআবিয়া তো কপর্দকহীন। তার নিকট কোনো সম্পদ নেই।<sup>২৬৪</sup>

অথচ এটা জানা কথা যে তাদের একজনের কাছে পরিধানের বস্ত্র-পরিমাণ সম্পদ হলেও ছিল আর অন্যজন নিদ্রাগমনসহ অন্যান্য কাজের সময় লাঠি নামিয়ে রাখতেন। ওয়া বিল্লাহিত তাওফিক।

### যারা খারাপ কথা বলে তাদের সাথে করণীয়

আল্লাহ তাআলা বলেন :

‘وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ’

‘যদি শয়তানের পক্ষ হতে আপনি কিছু কুমন্ত্রণা অনুভব করেন, তবে আল্লাহর শরণাপন্ন হোন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।’<sup>২৬৫</sup>

২৬৩. ইহইয়াউ উলুমুদ দীন: ৩/১৪০

২৬৪. সহীহ মুসলিম: ১৪৮০। গ্রন্থকার সহীহাইন বললেও হাদীসটি শুধু সহীহ মুসলিমে আছে।

২৬৫. সূরা হা-মীম সিজদা, ৪১ : ৩৬

তিনি আরও বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَافٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٢٦٦﴾

‘যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের ওপর শয়তানের আগমন ঘটায় সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে।’<sup>২৬৬</sup>

অন্যত্র বলেন :

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٢٦٧﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿٢٦٨﴾

‘তারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোনো মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের ওপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনেও তা-ই করতে থাকে না। তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রসবণ—যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা আমল করে তাদের জন্য কতই-না চমৎকার প্রতিদান।’<sup>২৬৭</sup>

১১৯. আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,  
"مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرُكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ"

‘যে ব্যক্তি শপথ করল আর সে তার শপথে ‘লাত ও উজ্জার’ নাম নিল, তার উচিত হলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা। আর যে তার সাথিকে এ কথা বলে, ‘এসো জুয়া খেলি’, সে যেন সদকা করে।’<sup>২৬৮</sup>

২৬৬. সূরা আরাফ, ৭ : ২০১

২৬৭. সূরা আল ইমরান, ৩ : ১৩৫-১৩৬

২৬৮. বুখারী: ৬৬৫০; মুসলিম: ১৬৪৭; আবু দাউদ: ৩২৪৭; তিরমিযী: ১৫৪৫; ইবনে মাজাহ: ২০৯৬



যে ব্যক্তি কোনো হারাম কথা বলে বা হারাম কাজ করে তার তৎক্ষণাৎ তওবা করা উচিত। আর তওবার আরকান বা শর্ত তিনটি।

১. তৎক্ষণাৎ উক্ত গুনাহকে ত্যাগ করা।
২. নিজের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া এবং
৩. ভবিষ্যতে গুনাহ না করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা।

গুনাহের সম্পর্ক যদি বান্দার সাথে হয় তবে উল্লেখিত তিন শর্তের সাথে অতিরিক্ত চতুর্থ একটি শর্ত যোগ হবে। তা হলো উক্ত ব্যক্তিকে তার হুক ফিরিয়ে দেওয়া অথবা তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে দায়মুক্ত হওয়া। এই আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

আর যখন কেউ কোনো গুনাহ হতে তওবা করে, তখন তার উচিত সমস্ত গুনাহ হতে তওবা করা। তবে নির্দিষ্ট একটি গুনাহের জন্য তওবা করলে তাও আদায় হবে। আর কেউ যদি ইতিপূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতে তওবা করার পর পুনরায় গুনাহ করে। এতে সে আবার গুনাহগার হবে। এবং এর জন্য তাকে আবার তওবা করতে হবে। তবে এতে তার প্রথম তওবা বাতিল হবে না। এটাই ‘আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের’ অভিমত। ওপরোল্লেখিত মাসআলা দুটিতে অবশ্য ‘মুতাজিলা সম্প্রদায়ের’ দ্বিমত রয়েছে। ওয়া বিল্লাহিত তাওফিক।

**উলামায়ে কেরামের এক জামাত কর্তৃক মাকরুহ ফাতওয়া**

**দেওয়া কিছু বিষয়, যা মূলত মাকরুহ নয়**

এই শিরোনামে আলাদা আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ও একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন ভ্রান্ত কথায় প্রতারিত হয়ে তাতে আস্থা স্থাপন না করে।

অবশ্য জ্ঞাতব্য যে, শরীয়তের আহকামসমূহ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। ওয়াজিব (ফরজ অর্থে), মুস্তাহাব (সুন্নাত অর্থে), হারাম, মাকরুহ এবং জায়েজ বা বৈধ। আর শরীয়তের কোনো আহকামই দলিল-প্রমাণ ছাড়া প্রতিষ্ঠিত

হয় না। আর শরীয়তের দলিল-প্রমাণও সর্বজনবিদিত (কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস)।

অতএব যে ব্যাপারে কোনো দলিল পাওয়া যায় না তার প্রতি ক্রক্ষেপ করার কোনো প্রয়োজন নেই। এবং এর বিরুদ্ধে জবাব দেওয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, এমন বিষয় কোনো দলিল নয়। আর তার জবাবদানে ব্রত হওয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই। তদুপরি উলামায়ে কেরাম দয়াপরবশ হয়ে এ ধরনের বিষয়াবলি বাতিল ও পরিত্যাজ্য হওয়ার ব্যাপারে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

ইমাম নববী (رحمہ اللہ) বলেন, ‘উপর্যুক্ত ভূমিকা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো এমন কিছু বিষয় আছে, কতিপয় আলেম যেগুলোকে মাকরুহ বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। কিন্তু আমি বলি, তা মাকরুহ নয় কিংবা এটা ভ্রান্ত কথা। আর তা বাতিল হওয়ার ব্যাপারে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করাও জরুরি নয়। যদি দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেও থাকি তবে তা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও আমার পক্ষ হতে অনুগ্রহমাত্র।

এই শিরোনামে নতুন আলোচনার অবতারণা করার আরও একটি উদ্দেশ্য, সঠিক আলোচনার মধ্য হতে ভুলভ্রান্তি নির্ণয় করা। যাতে করে এ সকল ভুল বিষয় যাদের প্রতি সম্পর্কযুক্ত করা হয় (যারা এসব বলেছেন)। তাদের মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের কারণে মানুষ ধোঁকায় না পড়ে।

জেনে রাখা দরকার, এই আলোচনায় আমি কোনো ভুল বা ভ্রান্ত কথার প্রবক্তার নামোল্লেখ করব না। কেননা, এতে তার মর্যাদাহানি ও কু-ধারণার শিকার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাদের ছিদ্রান্বেষণ আমার উদ্দেশ্য নয়; বরং তাদের বর্ণিত ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা। চাই এর সাথে তাদের সম্পর্ক সঠিক বলে প্রমাণিত হোক বা না হোক। যদি সঠিক হয় তবুও এতে তাদের সুপরিচিত মর্যাদায় কোনো খুঁত পড়বে না। অবশ্য এর মধ্যে কিছু কিছু শব্দের সাথে এ ধরনের



ব্যক্তিবর্গের সঠিক ও অর্থবোধক সম্পর্ক রয়েছে। এবং তাতে বাহ্যিক অবস্থার বাইরে অন্য কোনো অর্থ ও উদ্দেশ্যের সম্ভাবনাও থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে তাদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যাতে এ ব্যাপারে অন্যান্য আলেমও চিন্তা-ভাবনা করে। তা ছাড়া এটাও হতে পারে যে, তার এবং আমার দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। আর দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতাকে মেনে নেওয়ার দ্বারা পূর্ববর্তীদের মতামতও শক্তিশালী হয়। ওয়া বিল্লাহিত তাওফিক।

### মাকরুহ সম্পর্কিত ভ্রান্ত বক্তব্যসমূহ

১. এ ধরনের আলোচনায় অন্যতম একটি হলো ইমাম আবু জাফর নাহহাস (رحمه الله)-এর একটি বক্তব্য। তিনি তার শরহ আসমাইল্লাহি তাআলা গ্রন্থে কতিপয় আলেমের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'تَصَدَّقَ اللَّهُ عَلَيْكَ' আল্লাহ তোমাকে সদকা করুন' বলা মাকরুহ। কেননা, সদকাদাতা সাওয়াব ও বিনিময়ের আশা পোষণ করে। আর আল্লাহ তাআলার পক্ষে তা অসম্ভব।

গ্রন্থকার বলেন, 'এই বিধান আরোপ করা স্পষ্ট ভুল, মারাত্মক অজ্ঞতা এবং এর দ্বারা দলিল পেশ করা চরম বিভ্রান্তি। কেননা, আল্লাহ তাআলার সদকা-বিষয়ক হাদীস রয়েছে।

১২০. উমর ইবনুল খাত্তাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, নামাজ কসর করার ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"صَدَقَةُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ"

'এটা এমন সদকা, যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন। অতএব তোমরা এ সদকাকে কবুল করো।'২৬৯

২. তন্মধ্যে নাহহাস (رحمه الله)-এর আরও একটি বক্তব্য রয়েছে, যা তিনি পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'اللَّهُمَّ اعْتَقِنِي مِنَ النَّارِ' হে আল্লাহ, আপনি আমাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি

২৬৯. সহীহ মুসলিম: ৬৮৬; আবু দাউদ: ১১৯৯; তিরমিযী: ৩০৩৫; ইবনে মাজাহ: ১০৬৫

দান করুন' বলা মাকরুহ। কেননা, মুক্তি তিনিই দান করেন, যিনি সাওয়াবের আশা রাখেন।

ইমাম নববী (رحمہ اللہ) বলেন, 'তার এই দলিল জঘন্য ভুল ও শরীয়তের বিধান সম্পর্কে লজ্জাজনক অজ্ঞতা। আমি যদি ওইসব সহীহ হাদীস একত্র করি যেখানে আল্লাহ তাআলা তার বান্দা এবং মাখুলক হতে যাকে ইচ্ছা জাহান্নাম হতে মুক্তি দেওয়ার বর্ণনা রয়েছে। তাহলে গ্রন্থটি দীর্ঘ ও বিরক্তিকর হয়ে যাবে।

এ বিষয়ক হাদীসসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি :

১২১. আবু হুরাইরা (رضی اللہ عنہ) হতে বর্ণিত, নবী করিম (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ

'যে ব্যক্তি কোনো মুমিন কৃতদাসকে মুক্ত করল, আল্লাহ তাআলা তার (মুক্ত দাসের) প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে মুক্তিদাতার এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাহান্নাম হতে মুক্ত করে দেবেন।'<sup>২৭০</sup>

আরেক হাদীসে আছে :

১২২. আয়েশা (رضی اللہ عنہ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ

'আরাফার দিন অপেক্ষা এমন কোনো দিন নেই যেদিন আল্লাহ তাআলা অত্যধিক পরিমাণে বান্দা জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন এবং তিনি নিকটবর্তী হন।'<sup>২৭১</sup>

৩. আরও একটি ভুল কথা হলো কেউ কেউ বলেন যে, 'افْعَلْ كَذَا عَلَى اسْمِ اللَّهِ' 'আল্লাহর নামের ওপর এমন করো' বলা মাকরুহ। কেননা, আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার নাম সকল বস্তুর ওপরে আগে থেকেই রয়েছে।

কাজী আয়াজ (رحمہ اللہ) বলেন, এই কথাকে মাকরুহ আখ্যা দেওয়া ভুল।

২৭০. বুখারী: ৬৭১৫; মুসলিম: ১৫০৯।

২৭১. সহীহ মুসলিম: ১৩৪৮; সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩০১৪; সহীহ ইবনে হিব্বান: ৩৯২৬



১২৩. জুন্দুব বিন সুফিয়ান (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ঈদুল আযহার দিন সাহাবায়ে কেলামকে লক্ষ্য করে বলেন,

إِذْبَحُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ

তোমরা আল্লাহর নামে জবেহ করো। অর্থাৎ ‘বিসমিল্লাহ’ বলে জবেহ করো।<sup>২৭২</sup>

৪. নাহহাস (رضي الله عنه) বিখ্যাত আলিমে দ্বীন, ফিকাহবিদ ও সাহিত্যবিশারদ আবু বকর মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া (رضي الله عنه)-এর বক্তব্য নকল করেন, তিনি বলেছেন,

ﷺ جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَنَا فِي مُسْتَقَرٍّ رَحْمَتِهِ

‘আল্লাহ আমাদের তাঁর স্থায়ী রহমতস্থলে একত্র করুন’ বলা মাকরুহ। কেননা, আল্লাহ তাআলার রহমত কোথাও স্থির হওয়ার চেয়ে বেশি বিস্তৃত। তিনি আরও বলেন, اِرْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ ‘আপনার রহমত দ্বারা আমাদের প্রতি রহমত করুন’ বোলো না।

নববী (ﷺ) বলেন, এই বাক্য দুটি নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো দলিল আছে বলে আমার জানা নেই। উপরন্তু এর দাবিদারগণও কোনো দলিল পেশ করেননি।

‘مُسْتَقَرٍّ رَحْمَتِهِ’ বা স্থায়ী রহমতস্থল দ্বারা সাধারণত জান্নাত বোঝানো হয়। তখন উদ্দেশ্য দাঁড়াবে, তিনি যেন আমাদের জান্নাতে একত্র করেন, যা চিরস্থায়ী ঘর, আবাসস্থল বা বসবাসের স্থান। আর সেখানে প্রবেশকারীগণ আল্লাহর রহমতেই প্রবেশ করবেন। অতঃপর সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এবং মল-মূত্রসহ যাবতীয় পঙ্কিলতা থেকে নিরাপদ থাকবে। আর এ সবই আল্লাহর রহমতে লাভ হবে। তাই এই বাক্যের মাধ্যমে দুআকারী যেন এ কথাই বলছে, হে আল্লাহ, আপনি আমাদের এমন স্থায়ী আবাসে মিলিত করুন, যা আমরা আপনার রহমতেই অর্জন করব।

৫. ইমাম নাহহাস (رحمہ اللہ) উল্লেখিত আবু বকর (رضی اللہ عنہ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে আরও বলেন, তিনি বলেছেন যে, 'اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ' 'হে আল্লাহ, আপনি আমাদের জাহান্নাম হতে রক্ষা করুন' এবং 'اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ' 'হে আল্লাহ, আপনি আমাদের নবীজি (ﷺ)-এর শাফাআত নসীব করুন' বলবে না। কেননা, নবীজি (ﷺ)-এর শাফাআত তাদের জন্য হবে, যাদের ওপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে।

ইমাম নববী (رحمہ اللہ) বলেন, 'এটা সীমিতরিজত ভুল এবং স্পষ্ট অজ্ঞতা। মানুষের ধোঁকায় পড়ার সম্ভাবনা দেখা না দিলে এবং এ ধরনের কথা বই-পুস্তকে লিপিবদ্ধ না থাকলে আমি তা উল্লেখ করার ধৃষ্টতাও দেখাতাম না। কতশত সহীহ হাদীসে পরিপূর্ণ মুমিনের জন্য রাসূল (ﷺ)-এর শাফাআতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

রাসূল (ﷺ) বলেন,

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَدَّنُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي

'যে ব্যক্তি মুআজ্জিন যা বলবে তার অনুরূপ বলবে, তার জন্য আমার শাফাআত আবশ্যিক হয়ে পড়বে।'<sup>২৭৩</sup>

এ ধরনের আরও উদাহরণ রয়েছে।

এ ব্যাপারে বিশিষ্ট ফিকাহবিদ, হাফিজে হাদীস ইমাম আবুল ফযল আযাজ (رحمہ اللہ) উত্তম কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'সালাফে সালিহীন (সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ী প্রমুখ) কর্তৃক রাসূল (ﷺ)-এর শাফাআত লাভের দুআ ও আশা পোষণের কথা ব্যাপক প্রসিদ্ধ ও বহুল আলোচিত বর্ণনাবলির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। তাই যারা 'শাফাআত শুধু গুনাহগারদের জন্য' ধারণা করে শাফাআতের দুআকে মাকরুহ মনে করে, তাদের কথায় কর্ণপাত্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই।

২৭৩. মুসলিম: ৩৮৪, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (رضی اللہ عنہ) হতে। তবে মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আগে-পরে আরও কথা রয়েছে এবং মুসনাদে আহমাদে বর্ণনায় মুসলিমের চেয়ে কিছু কথা বেশি আছে। (অনুবাদক)



কেননা, সহীহ মুসলিমসহ হাদীসের অন্যান্য কিতাবে এমন-সব লোকের ব্যাপারে শাফাআতের বর্ণনা এসেছে, যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। আবার জান্নাতে উচু মর্তবা লাভকারী বিভিন্ন জামাতের ব্যাপারেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘বোধজ্ঞানসম্পন্ন ও নিজের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকারকারী ব্যক্তিমাত্রই ক্ষমার মুখাপেক্ষী এবং ধ্বংসের আশঙ্কায় শঙ্কিত হবে।

যারা শাফাআতের দুআকে মাকরুহ মনে করে, তাদের রহমত ও মাগফিরাতের দুআ করা উচিত নয়! কেননা, এগুলোও তো গুনাহগারদের জন্যই।’

এ সবই সর্বজনবিদিত সালাফ ও খালাফ (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পুণ্যবানদের) এর দুআর বিপরীত।

৬. আবু বকর (رضي الله عنه) হতে ইমাম নাহহাস (رحمته الله) আরও বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

‘تَوَكَّلْتُ عَلَى رَبِّي الرَّبُّ الْكَرِيمُ’ আমি আমার প্রতিপালকের প্রতি ভরসা করছি, যিনি দয়াময় প্রভু’ বলবে না; বরং শুধু ‘تَوَكَّلْتُ عَلَى رَبِّي الْكَرِيمِ’ আমি আমার দয়ালু প্রতিপালকের ওপর ভরসা করলাম’ বলবে।’

ইমাম নববী (رحمته الله) বলেন, ‘তার এই কথার কোনো ভিত্তি নেই।’

৭. উলামায়ে কেরামের এক জামাতের মতে বাইতুল্লাহ তথা কাবাঘরের তাওয়াফের সময় তাওয়াফকে ‘شَوِّطُ’ ‘শাওতুন’ চক্কর, একবার, দফা ইত্যাদি বা ‘دَوْرُ’ ‘দাওর’ চক্র, প্রদক্ষিণ ইত্যাদি না বলা। তাদের মতে একবার তাওয়াফকে ‘طَوَّافَةٌ’ ‘তাওফাতুন’ একবার তাওয়াফ, দুইবার তাওয়াফকে ‘طَوَّافَتَانِ’ ‘তাওফাতানে’ দুইবার তাওয়াফ, তিনবার তাওয়াফকে ‘طَوَّافَاتُ’ তাওফা-তুন এবং সাতবার তাওয়াফকে ‘طَوَّافٌ’ তাওয়াফ বলবে।

ইমাম নববী (رحمته الله) বলেন, ‘তাদের এ কথার কোনো ভিত্তি আছে বলে আমার জানা নেই। সম্ভবত জাহিলী যুগে ব্যবহৃত হতো বলে তারা ‘শাওত’ ও ‘দাওর’ শব্দের ব্যবহার অপছন্দ ও মাকরুহ বলে থাকেন।

কিন্তু সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য মত হলো এসব শব্দের ব্যবহারে মাকরুহ হওয়ার মতো কিছু নেই। কেননা, হাদীসে ‘شَوَاطُ’ শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়।’

১২৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَزْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَلَمْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَزْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا، إِلَّا الْإِبْقَاءَ عَلَيْهِمْ

রাসূল (ﷺ) তাদের তাওয়াফের প্রথম তিন ‘শাওত’ অর্থাৎ চক্রে রমল করতে বলেন। এবং দয়াবশত তিনি তাদের সকল চক্রে রমল করতে আদেশ করেননি।<sup>২৭৪</sup>

৮. তন্মধ্যে আরও একটি হলো, ‘صُمْنَا رَمَضَانَ’ ‘আমরা রমজানের রোজা রেখেছি’ এবং ‘جَاءَ رَمَضَانُ’ ‘রমজান এসেছে’ ইত্যাদি এমন কথা বলা, যদ্বারা রমজান মাস উদ্দেশ্য হয়। এ ধরনের কথা বলা মাকরুহ কি না তা নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। পূর্ববর্তী আলেমগণের এক জামাত মাসের প্রতি সম্বন্ধ না করে ‘রমজান’ শব্দের ব্যবহারকে মাকরুহ বলেছেন। হাসান বসরী ও মুজাহিদ (رضي الله عنه) হতেও এই মতটি বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম বাইহাকী (رحمته الله) বলেন, ‘এদের দুজন হতে বর্ণনার সনদটি দুর্বল।’

ইমাম নববী (رحمته الله) বলেন, আমাদের শাফেয়ী মাজহাবের উলামায়ে কেরামের মত হলো ‘রমজান’ শব্দ দ্বারা রমজান মাস বোঝানোর মতো কোনোরূপ ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া ‘جَاءَ رَمَضَانُ’ ‘রমজান এসেছে’, ‘دَخَلَ رَمَضَانُ’ ‘রমজান প্রবেশ করেছে’ এবং ‘خَفَرَ رَمَضَانُ’ ‘রমজান হাজির হয়েছে’ ইত্যাদি বলা মাকরুহ।

আর যদি মাসের প্রতি ইঙ্গিতমূলক শব্দ পাওয়া যায়, তবে এ ধরনের কথা মাকরুহ হবে না। যেমন : ‘صُمْتُ رَمَضَانَ’ ‘আমি রমজানের রোজা রেখেছি’, ‘قُتِمْتُ رَمَضَانَ’ ‘রমজানের রাতে কিয়াম করেছি’ (নামাজ পড়েছি),

২৭৪. বুখারী: ১৬০২; মুসলিম: ১২৬৬



‘يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ’ ‘রমজানের রোজা ওয়াজিব’ (ফরজ অর্থে) এবং ‘حَضَرَ رَمَضَانَ الشَّهْرُ الْمُبَارَكُ’ বরকতময় মাস রমজান উপস্থিত হয়েছে ইত্যাদি।

এটাই শাফেয়ী মাজহাবের অভিমত। এই মাজহাবের বিখ্যাত দুই ইমাম কাজী আবুল হাসান মাওয়ারদী (رحمته) তার আল-হাওয়া গ্রন্থে এবং আবু নসর আস-সব্বাগ (رحمته) তার আশ-শামিল গ্রন্থে এই মত ব্যক্ত করেছেন।

এই দুজন ছাড়াও শাফেয়ী মাজহাবের অন্যান্য উলামায়ে কেরামও এই মতই ব্যক্ত করেছেন। আর তাদের এই মতের দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীস :

১২৫. আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"لَا تَقُولُوا رَمَضَانُ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَلَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَانَ"

‘তোমরা শুধু রমজান বোলো না, কেননা রমজান আল্লাহ তাআলার নামসমূহের মধ্য হতে একটি নাম। তোমরা বরং ‘রমজান মাস’ বোলো।’<sup>২৭৫</sup>

এই হাদীসটি যঈফ। ইমাম বাইহাকী (رحمته) এই হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। আর হাদীসটি যঈফ বা দুর্বল হওয়াটা খুব স্পষ্ট।<sup>২৭৬</sup> কেননা, ‘আল্লাহ তাআলার’ নাম-বিষয়ক অনেক গ্রন্থ অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু কেউই ‘রমজান’-কে আল্লাহ তাআলার নাম বলে উল্লেখ করেননি।<sup>২৭৭</sup>

আর সঠিক মত হলো সহীহ বুখারীতে ইমাম আবু আব্দুল্লাহ বুখারী (رحمته)-সহ মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের অনেকেই যা বর্ণনা করেছেন (আল্লাহই সর্বজ্ঞ) তা হলো, ‘রমজান’ শব্দটি যেভাবেই ব্যবহার করা হোক তাতে মাকরুহের কিছু নেই। কেননা, শরীয়তের বিধান হিসাবে শরয়ী দলিলের মাধ্যমেই মাকরুহ প্রমাণ হতে হবে। আর তা এমন কোনো দলিল দ্বারা

২৭৫. বাইহাকী, সুনানুল কুবরা : ৪/২০১; ইবনুল জাওয়াযী (رحمته)-এর মাওয়াযাত : ২/১৮৭; আল ইলালুল মুতানাহিয়াতি ফিল আহাদিসিয়-যঈফি ওয়াল ওয়াহিয়াহ : ৮৩৪; ফাওয়াইদুল মাজমুআহ : ৮৭; ইবনে আদী (رحمته)-এর আল কামিল ফি-যুআফা : ৭/২৫১৭। হাদীসটি যঈফ। কেউ কেউ জালও বলেছেন।

২৭৬. এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের একজন হলেন মুহাম্মদ আবি মাশার নাজীহ আল মাদানী। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ও ইয়াহইয়া ইবনে মুঈনসহ অনেকেই তার ব্যাপারে বিভিন্ন শব্দে আপত্তি করেছেন। আল মাওয়াযাত : ২/১৮৭; ইবনুল হাজার (رحمته) রচিত ফতহুল বারী : ৪/১১৩, হাদীস নং ১৮৯৮। (অনুবাদক)

২৭৭. আল্লামা ইবনুল জাওয়াযী (رحمته) বলেন, ‘সর্বসম্মতভাবে আল্লাহ তাআলাকে ‘রমজান’ নামে ডাকা জায়েজ নেই।- আল মাওয়াযাত : ২/১৮৭। (অনুবাদক)

প্রমাণিত নয়; বরং বিভিন্ন হাদীসে সাধারণভাবে 'রমজান' শব্দের ব্যবহার জায়েজ বলেই প্রমাণ পাওয়া যায়। সহীহাইনসহ অসংখ্য হাদীসের কিতাব হতে এর প্রমাণ মেলে।

ইমাম নববী (رحمہ اللہ) বলেন, এতৎসংক্রান্ত হাদীসসমূহ একত্র করার সুযোগ হলে আশা করি তা দুই শ হবে। তবে মূল উদ্দেশ্য একটি হাদীস দ্বারাই অর্জন করা যায়।

আর তার জন্য নিম্নোক্ত হাদীসটিই যথেষ্ট :

১২৬. আবু হুরাইরা (رضی اللہ عنہ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,  
 "إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُحْتِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ"

‘যখন রমজান আসে, তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শয়তানকে বন্দী করা হয়।’<sup>২৭৮</sup>

সহীহাইনের কোনো কোনো বর্ণনায় ‘إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ’ ‘যখন রমজান আসে’ এর স্থলে ‘إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ’ ‘যখন রমজান প্রবেশ করে’ উল্লেখ রয়েছে।

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় ‘إِذَا كَانَ رَمَضَانُ’ ‘যখন রমজান হয়’ উল্লেখ রয়েছে।<sup>২৭৯</sup>

সহীহ বুখারীর টীকায় ‘لَا تَقْدَمُوا رَمَضَانَ’ ‘তোমরা রমজানকে এগিয়ে এনো না’ বলা হয়েছে।<sup>২৮০</sup>

এ ছাড়া সহীহ বুখারীর হাদীস ‘بَيْنِي وَإِسْلَامِي عَلَى خَمْسٍ’ ‘ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি’ শীর্ষক হাদীসের মধ্যে ‘وَصَوْمُ رَمَضَانَ’ ‘এবং রমজানের রোজা’ উল্লেখ রয়েছে।<sup>২৮১</sup>

২৭৮. সহীহ বুখারী: ১৮৯৯; সহীহ মুসলিম: ১০৭৯

২৭৯. মুসলিম: ১০৭৯

২৮০. ইবনু হাজার (رحمہ اللہ) রচিত ফতহুল বারী: ৪/১২৮, হাদীস নং ১৯১৪।

২৮১. বুখারী: ৮; মুসলিম: ১৬



৯. পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের কেউ কেউ বলেন, ‘سُورَةُ الْبَقَرَةِ’ সূরা বাকারা (গাভির সূরা), ‘سُورَةُ الدُّخَانِ’ সূরা দুখান (ধোঁয়ার সূরা), ‘سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ’ সূরা আনকাবুত (মাকড়সার সূরা), ‘سُورَةُ الرُّؤْمِ’ সূরা রুম (রোমের সূরা) এবং

‘سُورَةُ الْأَخْزَابِ’ সূরা আহযাব (বাহিনীর সূরা) ইত্যাদি বলা মাকরুহ।

তারা বলেন, উল্লেখিত পদ্ধতিতে না বলে বরং এভাবে বলবে,

‘السُّورَةُ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ’ ‘ওই সূরা, যার মধ্যে গাভির আলোচনা রয়েছে এবং ‘السُّورَةُ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا النَّسَاءُ’ ‘ওই সূরা, যাতে নারীর আলোচনা রয়েছে’ ইত্যাদি।<sup>২৮২</sup>

ইমাম নববী (رحمته) বলেন, ‘এই মতটি সুস্পষ্ট সুন্নাহবিরোধী। কেননা, অসংখ্য হাদীসে এ ধরনের শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়।

রাসূল (ﷺ) বলেন :

الْآيَاتُ مِنَ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত যে ব্যক্তি রাতে তা পাঠ করবে, আয়াতদ্বয় তার জন্য যথেষ্ট হবে।<sup>২৮৩</sup> হাদীসটি সহীহাইনে রয়েছে।

এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

১০. মুতরিফ (رحمته) বলেন, ‘إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ’ ‘আল্লাহ তাআলা তার কিতাবে বলেন’ বলা মাকরুহ। তিনি বলেন, এভাবে বলবে ‘إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ يَقُولُ’ ‘আল্লাহ তাআলা বলেছেন’। কেননা, ‘يَقُولُ’ বলা ‘শব্দটি ‘مُضَارِعٌ’ অর্থাৎ বর্তমান ও ভবিষ্যৎকাল বোঝায়। আর আল্লাহ তাআলার কথা তার ‘সিফাতে কালামে’র অন্তর্ভুক্ত। যা পুরোনো এবং স্থায়ী।<sup>২৮৪</sup>

২৮২. আত-তিবয়ান ফি আদাবি হামালাতিল কুরআন : ৪৩৪।

২৮৩. বুখারী : ৫০৪০; মুসলিম : ৮০৭। তবে ফাতহুল বারী : ৯/৮৭

২৮৪. আত-তিবয়ান ফি আদাবি হামালাতিল কুরআন : ১/১৫৬-১৫৭ (শামেলা)। ইমাম আবু দাউদ মুতরিফ

(رحمته)-এর এই বর্ণনা নকল করেন। (অনুবাদক)

ইমাম নববী (رحمہ اللہ) বলেন, ‘তার এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, অসংখ্য সহীহ হাদীসে রাসূল (ﷺ) হতে বিভিন্নভাবে এ ধরনের শব্দের ব্যবহার প্রমাণিত।

আমি মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় এবং আদাবুল কুররাতে এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

‘وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ’

‘আর আল্লাহ সঠিক কথা বলেন।’<sup>২৮৫</sup>

সহীহ মুসলিমে নিম্নোক্ত হাদীস রয়েছে :

আবু যর (رضی اللہ عنہ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

“يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا)

‘আল্লাহ তাআলা বলেন,

‘مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا’

‘যে ব্যক্তি একটি সাওয়াবের কাজ করবে, তাকে তার দশ গুণ দেওয়া হবে।’ (সূরা আনআম, ৬ : ১৬০)<sup>২৮৬</sup>

সহীহ বুখারীতে সূরা আল ইমরানের ৯২ নং আয়াত ‘لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ ‘ تَنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ‘ এর তাফসীরে আবু তালহা (رضی اللہ عنہ) বলেন, ‘يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ‘ اللَّهُ يَقُولُ ‘ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা বলেন,

‘لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تَنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ’

তোমরা কিছুতেই পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের প্রিয় বস্তু ব্যয় করবে।’<sup>২৮৭</sup>

تمت بتوفيق الله تعالى

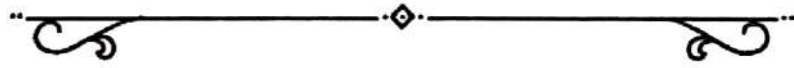
২৮৫. সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪

২৮৬. সহীহ মুসলিম : ২৬৮৭; ইবনে মাজাহ : ৩৮২১; বুখারী : ৭৪০৫

২৮৭. বুখারী : ৪৫৫৪



একবার কুসসা বিন সাঈদাহ ও আকছাম বিন সাইফী একত্র  
হলেন। তাঁদের একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনি  
আদমসন্তানের মধ্যে কী পরিমাণ দোষ খুঁজে পেয়েছেন?’  
অন্যজন বললেন ‘এ তো গণনার চেয়েও বেশি। তবে আমি গণনা করে  
আট হাজার দোষ খুঁজে পেয়েছি। আর মানুষের মধ্যে এমন একটি  
অভ্যাসও আমি পেয়েছি যা চর্চা করলে তার সব দোষ গোপন থাকবে।’  
প্রথমজন জানতে চাইলেন, ‘সেটি কী?’  
দ্বিতীয়জনের উত্তর, ‘জবানের হেফাজত তথা ভাষার সংযত ব্যবহার।’



মাকআবালুত নূর

© ০১৯৭১-৯৬০০৭১, ০১৬২৯-৬৭৩৭১৮  
© ১১/১ ইসলামী টাওয়ার ২য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা।